বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ১২৫-১৪৮
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বাংলাদেশে নীতি ও ন্যায্যতা চিন্তার ভূমিকা এবং অমর্ত্য সেন-উত্তর ন্যায্যতার ভাবনা

আহমেদ জাভেদ*

মূল শব্দ: *নীতি ও ন্যায্যতা ভাবনা, অমর্ত্য সেন ও ন্যায্যতা, চুক্তিমূলক ন্যায্যতা, সামাজিক চুক্তি, সমস্থিতি, ন্যায্যতা প্রশ্নে হবস, জিউম, রলস ও স্মিথ।*

১. ভুল থেকে শেখা

প্রথম ঘটনা

২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখের ঘটনা। আমি ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছিলাম। সঙ্গে আমার স্ত্রী। দু সপ্তাহ আগে আমি কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েছি। ভাড়ায় চালিত একটি সিএনজি অটোরিকশায় উঠলাম আমরা দুজন। ভাড়া ঠিক হলো ২০০ টাকা। ভেবেছিলাম যাত্রাপথে সিএনজি চালককে অনুরোধ করে থেমে এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলে নেব। কিন্তু বিধিবাম। সে রকম কোনো কিছু আসার আগেই সিএনজিটির ব্রেক বা ক্লাচ-এর (কোনো একটি হবে) তার ছিঁড়ে যায়। সিএনজির চালক ভাইটি বললেন যে, এখন গাড়ির ইঞ্জিন গরম কাজ করা যাবে না। সবমিলিয়ে দেড় ঘণ্টার বেশি লাগবে। আমরা অপেক্ষা বরতে রাজি হলাম। কিন্তু তিনি সেটি গ্রহণ করবেন না। তিনি বললেন, আপনারা অসুস্থ রোগী, হাসপাতাল যাচ্ছেন, আপনাদের দেরি করানোটা ঠিক হবে না। তার বিবেচনা বোধ দেখে আমরা দুজনেই হতবাক। তিনি একইরকম অন্য একটি সিএনজি অটোরিকশা থামালেন। কিন্তু নতুন চালকের জন্য ৪০ শতাংশ পথ বাকি থাকলেও তিনি ভাড়া হাঁকলেন দেড় শ টাকা। অতপর নতুন চালক বললেন আমি ১২০ টাকা হলে যাব, অন্যথায় না। এরপর আমি পুরোনো সদয় চালকটির দিকে তাকালে আমাকে তিনি বললেন, আমাকে ১০০ টাকা দিলেই চলবে! আমরা বললাম এটি অপনার জন্য কম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের কাছে নগদ অর্থ না থাকায় সে টাকাটুকুও নতুন চালক থেকে আমাদের ধার করে পুরোনো চালককে দিতে হয়। এতে আমার স্ত্রী ও আমি দুজনেই বেশ বিব্রত বোধ করছিলাম। সংবেদনশীল সেই পুরোনো চালকটি কষ্ট পেলেও মুখে হাসি নিয়েই আমাদের সঙ্গের ব্যাগগুলো নতুন বাহনে উঠিয়ে আমাদের বিদায় দিলেন।

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, দ্য পিপল্‌স ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন
ফোন: ০১৯১৪৪৪৪৩২০, ই-মেইল: ronieleo@gmail.com

নতুন বাহনে চড়ে আমাদের বারবারই আগের চালকটির মায়াভরা মুখটির কথা মনে হচ্ছিল। অবশেষে এটিএম বুথ থেকে টাকা উঠিয়ে দ্বিতীয় চালকের ভাড়া দেওয়ার সময় ১২০ পরিবর্তে ২০০ টাকা দিয়ে দিলাম। এবার আমার স্ত্রী আগের চেয়ে বেশ সরব হলো, বলল—এটি কোনোভাবেই 'ন্যায্য' হয়নি। আমারও মনে হলো, ও তো ঠিকই বলছে—এটি ঠিক হয়নি। কিন্তু কেন? এই ঘটনাটির বিশ্লেষণ দিয়েই ন্যায্যতার আলোচনা শুরু করব।

কোনো কাজ যখন আমরা করি, তার মূল্যায়ন আমরা কীভাবে করি? কাজটি করার আগে যেসব বিবেচন করি, আর কাজটি করে ফেলে পেছনে ফিরে দেখে যখন সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন করি—এই দুই বিবেচনার ভিত্তিগুলোই বা কী? অতীতের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন কি আমরা 'নিষ্পক্ষ দর্শক' হিসেবে করতে পারি? বিশেষ করে এই মুহূর্তের প্রয়োজন মেটানোর প্রবল উপযোগিতার আকর্ষণ থেকে মনকে নিষ্পক্ষ দর্শকে পরিণত করে সু-স্থায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারি? আমাদের যাত্রাপথের ঘটে যাওয়া ঘটনায় কি আমরা অতীত সিএনজি চালক ভাইটির জন্য কিছুটা 'ইচ্ছাকৃত' ও অসংবেদনশীল সিদ্ধান্ত নিইনি? দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, হ্যাঁ করেছি। যেটি আমার স্ত্রীর বোধে ধরা পড়েছে এবং এটি নিয়ে সে কথা বলতে শুরু করেছে। যেটুকু পথ আমরা পুরোনো চালকের ঘাড়ে চড়ে এলাম, তার অবদানটির কথা বর্তমান উপযোগিতার বা বাড়তি তৃপ্তির টানে তা 'উপেক্ষা' করলাম।

উল্লিখিত ঘটনাটির ভেতর কী কী রয়েছে, তা নিয়ে আমি চিন্তা করতে লাগলাম। আমরা দুজন গাড়ি চালকের প্রতি কোনো রকম বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা, সমাজের বিদ্যমান অসম শ্রেণি অবস্থানের ক্ষমতা থেকে কোনো সিদ্ধান্তের বিষয়ে পরোক্ষ কোনো চাপ ছিল কিনা তার বিশ্লেষণ করতে পারি। আমাদের দেশে বৈষম্য ও অন্যায্যতা নিয়ে আলোচনা হলেও এগুলোর বিচারের ভিত্তিমূলীয় চিন্তাভাবনা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা চোখ পড়েনি। বৈষম্যের বিপরীতে সমদৃষ্টির আলোচনাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাংলাদেশে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সে আলোচনা জোরালোভাবে আসেনি। যখন আমরা বৈষম্যের কথাটি বলি, তখন আমরা আসলে কী বোঝাই? বোঝাই যে, কোনো কিছু মূল্যায়নের মূলভিত্তি হবে সমদৃষ্টি। সমদৃষ্টির জায়গাটি বাস্তবে টিকে থাকছে না বলেই বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে। যদিও আবার বৈষম্য টিকিয়ে রাখতে ও তার ধারাবাহিকতা রক্ষায় বস্তুগত আয়োজনও চালু রয়েছে। আবার সমদৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে বর্তমানে ও অতীতের ক্ষেত্রেও নানা প্রচেষ্টা ঘটার জ্ঞানগত ও চর্চার নানা ক্ষেত্রও রয়েছে।

সমদর্শিতাই ন্যায্যতা

আধুনিক সময়ে সমদৃষ্টির ভিত্তিতেই ন্যায্যতার দাবিটি অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে তোলা যায়,যার ধারাটি প্রায় এককভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন দার্শনিক জন রলস। এবিষয়ে তাঁর প্রথম লেখা 'জাস্টিস অ্যাজ ফেয়ারনেস'। ১৯৫৮ সালে এ প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তখনই রলসের চিন্তাটি ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয়। পরে ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় 'আ থিওরি অব জাস্টিস' গ্রন্থে এ তত্ত্বটিকে তিনি আরও পরিশীলিতভাবে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যান। রলসের আসল কথাটি ছিল ন্যায্যতাকে বুঝতে হবে সমদৃষ্টির দাবির ভিত্তিতে। অর্থাৎ সমদর্শিতাই হলো ন্যায্যতা নির্মাণের মূল ভিত্তি। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা সমাজ যদি ন্যায্যতায় পৌঁছাতে চায়, তবে তাকে সমদর্শিতার ভিত্তিভূমিতেই হাঁটতে হবে। এই পথে হেঁটেই সেখানে পৌঁছতে হবে। আমার মতে, রলসের এই ধারণার সমান্তরালে আমরা অমর্ত্য সেনের 'ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ ফ্রিডম' গ্রন্থে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ফ্রিডমের (তাঁর ভাষায় যেটি সক্ষমতা) পরিধি বাড়িয়ে

তুলতে হলে ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচ (সক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গি) গ্রহণ করতে হবে। সক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গিটি বাংলাদেশের জন্য যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা একটু ভালোভাবে লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে আমাদের বিদ্যায়তনিক পরিসরগুলো থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজের সব প্রতিষ্ঠান ও অপ্রতিষ্ঠানে এই অতিপ্রয়োজনীয় মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিটি কতটা উপেক্ষিত।

রলসের সমদর্শিতা ন্যায্যতা ধারণাটি কেবল সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান থেকে বোঝাই যথেষ্ঠ নয় বরং ন্যায্যতার প্রায় সব তত্ত্বে এটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এখানে তত্ত্বকথা আসবে কেন? কারণ, কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের ও স্থানের ঘটনাকে 'বদ্ধ নিষ্পক্ষ' গণ্ডির বাইরে প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এক ঘটনার ভেতরের সারবস্তুর মূল্যায়নের অনুসন্ধানে নেমেই এই ভ্রমণ করতে হচ্ছে। কার্যত বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন চিন্তাভাবনা, অভিপ্রায় ও সর্বজনীন ভাবধারারও সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করার একটি সুফল পাওয়া যেতে পারে। আর যদি সেটি করা সম্ভব হয়, তবে সমদর্শিতার পথে হাঁটার বাধাগুলো কাটিয়ে ন্যায্যতার সদর দরজায় উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

নিষ্পক্ষ দর্শক

এই জায়গায় এসে আমাদের অর্থশাস্ত্রের জনক অ্যাডাম স্মিথের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার সাহায্য নিতে হবে। যদিও সময়ের ক্রমে রলস আমাদের নিকটবর্তী এবং অ্যাডাম স্মিথের সময় আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগের এবং তিনি আমাদের থেকে বহুদূরের, অন্য গোলার্ধের (স্কটিশ) বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু রলসের চিন্তাটি পরিপূর্ণভাবে বুঝতে এবং এর কিছু সীমাবদ্ধতা কাটাতে স্মিথ আমাদের আরও প্রশস্ত রাস্তা দেখান। আর তাই আমার কাছে মনে হয়েছে যে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার মূল্যায়নে অ্যাডাম স্মিথের 'নিষ্পক্ষ দর্শক' (ইমপারশিয়াল স্পেক্টেটর) ধারণাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। স্মিথের বন্ধু দার্শনিক ডেভিড হিউম যুক্তিশীলতার প্রয়োগে মানব সংবেদনশীলতার গুরুত্ব জোরালোভাবে সামনে আনলেও স্মিথ হিউমের মতো ভাবতেন না। কিন্তু মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে মানুষের প্রাথমিক উপলব্ধির জোরালো অনুভূতির যেকথা হিউম তাঁর দার্শনিক প্রবন্ধাবলিতে বলেছেন, তার সঙ্গে স্মিথ একমত হলেও বহু ধরনের পরিস্থিতি ও তার পরিণামকে কার্যকারণ সম্পর্ককে স্মিথ যুক্তি দিয়েই বিচারের কথা বিপুলভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আর এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী দার্শনিক প্রকল্প হিসেবে তুলে ধরেছেন। ধারণাটি হলো 'নিষ্পক্ষ দর্শক' (স্মিথের 'দ্য থিওরি অব মরাল সেন্টিমেন্টস' গ্রন্থে)।

ক্রমবর্ধমান ন্যায্যতার ধারণা

নিজেদের জীবনযাপনের ভেতর দানা বেঁধে ওঠা কায়েমি স্বার্থ, নিজেদের সামনে এগিয়ে রাখার ঝোঁক, অযৌক্তিক ভাবনা, নানা ধরনের সংস্কার ইত্যাদি থেকে প্রভাবমুক্ত হয়ে স্মিথের নিষ্পক্ষতার দাবিকে প্রধানভাবে সামনে আনতে হবে। কারণ, রলস প্রবর্তিত 'সমদর্শিতাই ন্যায্যতা'—এই পথে চলতে গেলে স্মিথের নিষ্পক্ষতার মৌলিক দাবিটিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। রলসের চিন্তার এই সুতাটি হাতে তুলে নেন অমর্ত্য সেন। আমাদের সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক অমর্ত্য সেন রলস-উত্তর ন্যায্যতা তত্ত্বের সমূহ উন্নয়ন ঘটান। তিনি রলসের ধারণার 'আদর্শবাদী চিন্তা' থেকে বেরিয়ে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন অধিকতর ন্যায্যতার পথপদ্ধতির তত্ত্ব নির্মাণ করেন। অমর্ত্য সেনের মতে, রলসের ন্যায্যতা চিন্তাটি 'ট্রান্সেনডেন্টাল থিওরি অব জাস্টিস' বা ন্যায্যতার 'সর্বশ্রেষ্ঠান্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি'র ভিত্তিতে সৃষ্ট সে কথাটি

আমাদের সামনে আনেন। অমর্ত্য সেনের ঝোঁকটি হলো এই মুহূর্তের বাস্তব অবস্থার গুণগত পরিবর্তনের জন্য ন্যায্যতার ধারণা ও প্রয়োগ কীভাবে কাম্য সমাজের দিকে নিয়ে যাবে, তার ভিত্তি নির্মাণ করা। মোদ্দা কথা হলো, আমরা কীভাবে এগোতে পারি, তার পথ-পদ্ধতির অনুসন্ধানের তাগিদ তিনি আমাদের দিয়েছেন। আমার মতে, অমর্ত্য সেন অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্তভাবে সময় পরিবর্তনের আঙ্গিকটি তার ন্যায্যতার গতিশীল ভাবনায় সু-স্থায়ীভাবে ধারণ করতে পেরেছেন।

আমি এ বিষয়টির নাম দিয়েছি 'ইনক্রিমেন্টাল জাস্টিস' বা 'ক্রমবর্ধমান ন্যায্যতা'। এই লক্ষ্যে আমরা কীভাবে এগোবো, সে ধারণা ও চর্চার পথে সংগ্রাম করা। রলসের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ন্যায্যতা চিন্তার সীমাবদ্ধতা অমর্ত্য সেন আমাদের সামনে তাঁর ক্ষুরধার বিশ্লেষণী কাঠামোর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। কারণ, অমর্ত্য সেন মনে করেন, আমরা যে পৃথিবীটায় বাস করি, সেখানে প্রতিষ্ঠানগুলো ভুল-ত্রুটিমুক্ত নয় এবং যথাযথ আচরণও করে না। অমর্ত্য সেনের লেখা পড়ে আমার মনে হয়েছে যে, তিনি মনে করছেন প্রাতিষ্ঠানিক ন্যায্যতার ওপর আমাদের একমাত্র নির্ভরতা থাকলে, যেটি রলসের ন্যায্যতা চিন্তার একটি সীমাবদ্ধতা বলে তিনি (সেন) ব্যাখ্যা করেন—ব্যক্তির ন্যায্যতা পাওয়ার বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকে যাবে। অমর্ত্য সেন বর্তমান সময়ের মহান এক শিক্ষক। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, পরিস্থিতি নির্ভরতার কথা বলে প্রতিষ্ঠানের চয়নের অন্যায্যতা থেকে ব্যক্তির ন্যায্যতা ও যৌক্তিক আচরণ নিশ্চিত করতে না পারলে ন্যায্যতা প্রাপ্তির 'ক্রমবর্ধমান ন্যায্যতা'র পথে হাঁটা সম্ভব হবে না। তাঁর মতে, 'বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের মানুষের সক্ষমতা, সক্ষমতা ও কল্যাণকে প্রসারিত করে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে' প্রচলিত 'নিয়মনীতি ও অভ্যাসকে বাস্তবের দৃষ্টিকোণ থেকে' মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। অমর্ত্য সেনের মতে, ন্যায্যতার পথে 'সামাজিক বিভিন্ন অবস্থার মূল্যায়নে শুধু তৃপ্তিযোগের ওপর নির্ভর করার কোনো আবশ্যকতা নেই,... এমনকি অন্তিম অবস্থার ওপর নির্ভর করারও দরকার নেই। আমরা যথাযথ কাজ করছি, না আরও ভালো করতে পারতাম, সেটা বিচার করার ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন পরিণামের খুবই গুরুত্ব রয়েছে।' তিনি বলেন, 'ন্যায্যতার লক্ষ্যে যে জরুরি প্রশ্নটি নিরবচ্ছিন্নভাবে থেকেই যায় তা হলো, সবকিছু বাস্তবে কেমন চলছে, এবং তাদের আরও ভালো করে তোলা যায় কি না।' (নীতি ও ন্যায্যতা, পৃ. ১১০)।

নারীর সংবেদনশীলতা ন্যায্যতার পথে শক্তিবর্ধক

আমার কাছে মনে হয়, ন্যায্যতার প্রশ্নে নারীর সংবেদনশীলতা ও যুক্তি প্রয়োগের প্রখরতা পুরুষের তুলনায় বেশি। দার্শনিক ডেভিড হিউমের চিন্তা ও অনুজ্ঞাগুলো আমাদের শেখায় যে, 'মানব সংবেদনের (সেন্টিমেন্টস) জোরালো ভূমিকাটাকে অগ্রাহ্য না করেও যুক্তির গুরুত্বকে মেনে নেওয়ার'—যদিও প্রচলিত চিন্তায় সংবেদনের ভূমিকাটাকে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয় না। অমর্ত্য সেনের ভাষায়: 'হিউমের অন্তর্দৃষ্টি আমাদের শেখায়, যারা এই পৃথিবীর অন্যত্র আমাদের থেকে বহু দূরে বাস করেন; এমনকি যারা এখনো জন্মাননি, ভবিষ্যতে এই পৃথিবীর বাসিন্দা হবেন, তাদের কথা ভাবাও আমাদের দায়িত্ব।' হিউম যদিও সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে নারীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা অগ্রসরতার কথা সরাসরি বলেননি, তা সত্ত্বেও, যুক্তি প্রয়োগের সঙ্গে সংবেদনশীলতার চমৎকার সম্পর্কের প্রতি আমার আকর্ষণ তৈরি হলো। রবীন্দ্রনাথ ও অমর্ত্য সেন এ প্রসঙ্গে অনেক মূল্যবান দিক আমাদের সামনে উন্মোচন করেছেন। সেনের মতে, 'নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যটি নানারূপে দেখা দিতে পারে। ... বস্তুত এটি বহুবিধ সমস্যার একটি মিশ্র রূপ।' (সেন, তর্কপ্রিয় ভারতীয়, ২০০৫)। কিন্তু ন্যায্যতার অনুসন্ধান ও প্রতিষ্ঠায় নারীর যুক্তিচর্চার সঙ্গে নিজস্ব সংবেদনশীলতার জোরালো ব্যবহার পুরো পরিস্থিতির ওপর কতটা অগ্রসর প্রভাব রাখতে পারে, সেটি একটি বাস্তব ঘটনার মধ্যে দিয়েই উজ্জ্বল আলো ফেলল, অন্তত আমার জীবনে।

বিচ্ছিন্নতা মোকাবিলা

বাংলাদেশে যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে, এ দেশে বসবাসের কিছু বিশেষ আকর্ষণীয় দিক থাকলেও কতগুলো ঘাটতির দিকও রয়ে গেছে। আমাদের যাপিত জীবনে দুটো বড় ধরনের সমস্যা জীবনের গুণগত মানকে অবনমন করছে বলে আমার মনে হয়, যেগুলোর সমাধান আমাদের হাতের মধ্যেই রয়েছে। প্রথমটি হলো ক্রমাগতভাবে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করা। আর এই বিচ্ছিন্নতা চর্চার ফলে দ্বিতীয় সমস্যাটির সৃষ্টি। সেটি হলো আমাদের মনে নিজেদের যাপিত জীবন সম্পর্কে হীনম্মন্যতার বোধ নিয়ে একধরনের আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে ডুবে থাকা। একটি সমৃদ্ধ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় হলো যেসব সম্পর্ককে আমরা মূল্যবান মনে করি, সেগুলোর প্রতি আমাদের অনুভূতির বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তোলা। চিন্তাশীল সত্তা হিসেবে মানুষ হলো গঠনমূলক অভিজ্ঞতার বিশাল এক ভান্ডার। আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে কম বা বেশি যেটুকু জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হোক না কেন, সেটুকুই বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে যাপিত জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধি থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছি—তা কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি? সুন্দর জীবনের মূল কথা হলো আমরা আমাদের সীমিত সাধ্যের মধ্যে যেমন জীবনই যাপন করি না কেন, তার প্রতি আমাদের শতভাগ সততার দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। সততা না থাকলে জীবন অসুন্দর হয়ে যায়। কারণ, সত্যই সুন্দর। একথা জানলেও আমরা বাস্তবে প্রয়োগ করছি না কেন? আমাদের জীবনে যেসব অভিজ্ঞতা হয়, আমরা শুধু সেগুলো নিয়েই কথা বলতে পারি। আমরা আসলে যা নই, তা উপস্থাপনের চেষ্টা হলো অসুন্দরের পূজা। আমাদের জীবনের অভিমুখ হোক অনুন্নত জীবনবোধ থেকে উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনবোধের দিকে।

২. চুক্তিমূলক ন্যায্যতা

দ্বিতীয় ঘটনা

এই ঘটনটি ২৯ আগস্ট ২০২১ তারিখের। সকাল আটটা কি সাড়ে আটটা হবে। আসমা আপা বাসায় এলেন। আমি তখন বাসায় বসেই প্রাতিষ্ঠানিক কাজ করছিলাম। কোভিডের কারণে আমাদের অনেকেরই বাসাকেই কর্মস্থল বানাতে হয়েছে। নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে এটি শিখতেও হয়েছে। আসমা আপা আমাকে কথা বলার জন্য বেডরুমে আসতে বললেন। আমার স্ত্রীও কিছু আগেই ঘুম থেকে উঠেছে। আসমা আপা এসেছেন বাসার কাজের জন্য নতুন চুক্তি করতে, যেটি শুরু হবে পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে। আসমা আপাকে আমরা আগে থেকে চিনতাম না। তাকে এনে দিয়েছেন আমাদের দীর্ঘদিনের পরিচিত সাহিদার মা। তিনি আমাদের বাসার কাছের প্রতিষ্ঠান জি-মার্টে কাজ করেন। অবশ্য আসমা আপার সঙ্গে আমাদের পরিচয় গত ২০ আগস্টে। তিনি পরীক্ষামূলকভাবে ১০ দিনের জন্য আমাদের বাসার কিছু গৃহস্থালি কাজের জন্য ১ হাজার ২০০ টাকায় চুক্তি করেন। সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে আর মাত্র দুদিন বাকি। তাহলে ভবিষ্যতে অর্থাৎ আগামী মাস থেকে কী হবে? সেজন্যই তিনি আমার ও আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন।

কোভিডপূর্ব সময়ে ও কোভিডের সময়ে আমাদের বাসায় গৃহস্থালি কাজের জন্য সুদূর নেত্রকোণা থেকে তামান্নার মাকে এনে দিয়েছিলেন এই সাহিদার মা। তামান্নার মা ছিলেন আমাদের বাসার গৃহস্থালি কাজের জন্য স্থায়ী চুক্তির (প্রচলিত ভাষায় বাঁধাকাজে সহায়তাকারী) ভিত্তিতে মাসিক ৫ হাজার টাকা বেতনের ভিত্তিতে কাজ করতেন। তিনি শুরুতেই বলে দিয়েছিলেন যে তিনি সব মিলিয়ে দুই বছরই থাকবেন আমাদের বাসায়, এর বেশি নয়। তাকে বিনামূল্যে থাকাখাওয়া, অসুখ হলে চিকিৎসা ও বাড়িতে

যোগাযোগের জন্য ফোন দিতে হবে। এগুলো সবই একেবারে মৌলিক বিষয়। এতে আমরা কেন, যে-কেউই রাজি না হয়ে পারবে না। আমি ও আমার স্ত্রী সানন্দে এতে রাজি হয়েছি। কিন্তু তামান্নার মায়ের দুই বছর শেষ হয়েছে গত মাসে, কোরবানির ঈদে। ঈদের দিনই তিনি রাতে এই এলাকায় নেত্রকোণা থেকে আগত কিছু মানুষের সঙ্গে একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করে চলে গেছেন। একটি তাড়া তখন ছিল যে, ঈদের একদিন বাদেই সরকার আবার কঠোর লকডাউন ঘোষণা করেছে, ফলে তড়িৎ ফিরে না গেলে তাকে আটকা পড়তে হবে।

তখন অবশ্য বুঝিনি, তামান্নার মা একজন নারী উদ্যোক্তা হবেন এমন সংকল্পে ঢাকায় তিনি ব্যবসার প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহে এসেছেন। কারণ, গ্রামে তিনি যে অবস্থায় আছেন, সেখানে তার পক্ষে এই প্রাথমিক সম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। আর কে না জানে, ঢাকায় আয়ের সুযোগ বেশি এবং অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রে কাজের সুযোগ রয়েছে, যদিও নিরাপত্তা ও অন্যান্য নাগরিক অধিকারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত নয়। সে জন্যই তারা দেশের বাড়ির পরিচিতি সূত্র ও সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে শহরে এসে পুঁজি সংগ্রহ করে এবং নিজেদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটান। তামান্নার মা আমাদের বাসায় কাজের পরিশ্রমিক হিসেবে দুই বছরে পেয়েছেন ১ লাখ ২০ হাজার টাকা, যেগুলো তিনি কিছু মাস পরপরই গ্রামে বিকাশে পাঠিয়ে উর্বর জমি বর্গা চাষের চুক্তি করে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছেন। এই কাজে তিনি স্বামীকে বেশি ভরসা করেন না, বিধায় তার ভাইয়ের সহায়তা নিয়েছেন।

তামান্নার মায়ের রেশ অবশ্য আমাদের বাসা থেকে এখনো যায়নি। আমরা তো তার একেবারে গুণমুগ্ধ ছিলামই এর চেয়েও বড় কথা ছিল তার সঙ্গে আমাদের ছোট্ট দুটি সন্তানের সম্পর্ক ছিল অতুলনীয়। তারা তামান্নার মাকে খালাদাদু বলে ডাকত। আমাদের সন্তানদের ভাষায় খালাদাদুর হাতে মাখানো ভাত পৃথিবী সেরা। খালাদাদু তাদের তার নেত্রকোনার বাড়ির গল্প করত, আর এই শুনে আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে গ্রামের পরিবেশ নিজেদের চোখে দেখার আগ্রহের কথা প্রায়ই বলত। তবে ২৮ আগস্ট সন্ধ্যায় আসমা আপা তার মূলসূত্র সাহিদার মাকে নিয়ে বাসায় এসেছিলেন নতুন একটি চুক্তি করতে, যদিও সেটি কোনো আলোর মুখ দেখেনি। আমরা দুই পক্ষ একমত হতে পারিনি। নতুন চুক্তিতে পৌঁছাতে পারা ছিল তাই আমাদের জন্য ছিল এক আনন্দেরই ঘটনা। এখানে উভয়পক্ষের জন্য সেই ব্যর্থ চুক্তির অভিজ্ঞতার কথা না বললে, আমাদের আনন্দের বিষয়টি ঠিক বোঝানো যাবে না।

আমি ও আমার স্ত্রী দুজনেই তামান্নার মায়ের অভাববোধ পীড়া থেকে মুক্তির জন্য নতুন এমন একজনকে গৃহস্থালি কাজের জন্য খোঁজ করছিলাম, যিনি তামান্নার মায়ের মতোই আমাদের বাসায় থেকে বাঁধাকাজ করবেন ও একই রকমের মাসিক বেতন নেবেন। কিন্তু সাহিদার মা আসমা আপাকে ছাড়া কাউকে পাননি। আসমা আপা যে রুমটায় ভাড়া থাকেন, সেটি আমাদের পরের রাস্তার একটি ছোট্ট বাড়ির চিলেকোঠার রুম। সেখানে তার সন্তানের, যার নাম সিয়াম তার সঙ্গে আপার নিজের ভাইয়ের ছেলেও থাকে। আসমা আপা প্রথমেই বলে দিলেন, তামান্নার মায়ের মতো তিনি রাতে থাকতে পারবেন না। কারণ হলো তার পরিবার নিয়ে তিনি রাতে বাসায় ঘুমাতে চান। এটা তো খুবই স্বাভাবিক বিষয়। তিনি সারাদিন অর্থাৎ সকাল সাতটা থেকে রাত সাতটা পর্যন্ত থাকবেন এর জন্য তাকে অন্য সব বাসায় চলমান তার ছুটাকাজগুলো ছাড়তে হবে। আর তাই তিনি মাসিক বেতন হাঁকলেন ৮ হাজার টাকা। আমার স্ত্রী এ বেতন শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। তার রেফারেন্স পয়েন্ট হলো তামান্নার মায়ের মাসিক ৫ হাজার টাকার বেতন। আমার স্ত্রীর যুক্তি হলো বাঁধামানুষের বেতন ৫ হাজার টাকা হলে ছুটাকাজের জন্য এতটা কেন হবে? যদিও সিয়ামের মা বা আমাদের আসমা আপার কাজের যে পরিমাণ সময় দিতে হবে, তা

বাঁধামানুষের সময়ের প্রায় সমানই। উভয়পক্ষের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য সমস্থিতি বিন্দুর খোঁজে আলোচনা করতে করতে আমরা শেষপর্যন্ত মাসিক ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি হলাম এবং সঙ্গে দুই বেলা খাবার ও বিভিন্ন উৎসবপর্বে তার পরিবারের সকলকে পোশাক-আশাক ও মেহমান এলে বাড়তি কাজের সম্ভাব্য অর্থ এসবই আলাপ করলাম। কিন্তু আসমা আপা এ প্রস্তাবে রাজি নন। তাঁর এক কথা। মাসিক বেতন ৮ হাজার টাকার কমে তিনি এই পরিমাণ সময় দেবেন না। আমার স্ত্রী তার ওপর কিছুটা মনোক্ষুণ্ন হলো। আমার কাছে এখানে আমরা দুই পক্ষই সমান ও ফ্রি এজেন্ট হিসেবে মনে হলেও আমার স্ত্রী আসমা আপার চুক্তিতে না করার দৃঢ় সিদ্ধান্তটি প্রশস্ত মনে গ্রহণ করলেন না। আমার পরিস্থিতি এমন ছিল যে, আমি আমার স্ত্রীর মনোভাবের পরিবেশটি আমি কিছুতেই এড়াতে পারছিলাম না। ফলাফল হলো, আমরা কোনো চুক্তিতে পৌঁছতে পারলাম না।

ফিরে আসি আসমা অপার কথায়। এই দশ দিনে আসমা আপার যে বিষয়টি আমার ও আমার স্ত্রীর মন কেড়েছে, তা হলো বাচ্চদের সঙ্গে তার সম্পর্ক। আমার বাচ্চারা মানুষ তো মানুষ, আমাদের ফ্ল্যাট বাসাটির বারান্দার গাছগুলোর কথাও নাকি তারা বোঝে, তাদের কারণে আমাদের বাসার তেলাপোকা মারা যায় না, বারান্দায় দিনের কোনো একটা সময়ে হঠাৎ খেলতে আসা কিছু চড়ুইপাখির কিচিরমিচির শব্দ ও ঝগড়ায় তারা উত্তেজিত হয়, কোনো অজানা জায়গা থেকে নিয়মিত চলে আসা বেড়ালের জন্য তাদের অতিথিপরায়ণতার সংবেদনশীলতার সঙ্গে আসমা আপা একেবারে মিশে গেছেন। আসমা আপাই এ কদিনে বাচ্চাদের সঙ্গে এসব চমৎকার অভিজ্ঞতা বিনিময় ও এসব প্রাণীদের দূর্বোধ্য ভাষা অনুবাদের ঘনিষ্ট বন্ধু হয়ে উঠেছেন। বাচ্চাদের একঘেয়ে জীবন কিছুটা সহজ করতেই আমরা বাসায় একটি অ্যাকুয়ারিয়াম ও ছোট্ট দুটি লাভ বার্ড রেখেছি। আমি ও আমার স্ত্রী এসব সমৃদ্ধ মুহূর্ত থেকে বঞ্চিত। অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর কথাটিই সত্য, আমাদের চেয়ে আমাদের পরের প্রজন্ম প্রাণ ও পরিবেশের প্রতি বেশি সংবেদনশীল। আমার মতে, আমাদের বর্তমান প্রজন্ম তো উল্টো, যেগুলো পরিবেশের দূষণ বেশি সৃষ্টি করে সেগুলোই আমরা বেশি করে করতে পছন্দ করছি। আমাদের পরিবেশের বিবেচনা কেবল মুখেই। আমার মনে হয় যে, আমাদের উত্তর প্রজন্ম কেবল সংবেদনশীলতাই নয়, সামষ্টিক নৈতিকতার ক্ষেত্রেও অনেক অগ্রসর হবে। যে সমাজটি তারা গড়ে তুলবে সেটি আমাদের করা ভুলগুলোর ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে নতুন সংবেদনশীলতা ও যুক্তির ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে উচ্চতর সমাজ গড়ে তুলবে। আমরা মরে যাব, কেউ আমাদের মনেও রাখবে না। কারণ, আমরা মনে রাখার মতো কোনো কাজ করতে পারছি না, কিন্তু তারা আয়ু শেষ হলেও তারাই বেঁচে থাকবে, কারণ, তারা ভবিষ্যতের সুন্দর পৃথিবীর নির্মাণকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছে।

বাসার গৃহস্থালি কাজের অতিপ্রয়োজনীয় এ চুক্তির আলোচনায় ফিরে আসি। কথা শুরু হলো আসমা আপার সঙ্গে। আমাদের এলাকায় প্রতিটি গৃহস্থালির কাজের দর মাসে ৭০০ টাকা। ঠিক হলো ৫টি কাজ করবেন তিনি। মাসে মোট পাবেন ৩ হাজার ৫০০ টাকা। এখানে গৃহস্থালির কাজের বাজারদর যে স্থানভেদে ভিন্ন হয়, সে কথাটিও বলে রাখি। আমার বন্ধু একরামুল মিল্লাত। তিনি পরিবার নিয়ে থাকেন মিরপুর ১৪ নম্বর সেকশনে, কাফরুলে। তিনি একটি অডিট ফার্মে হিসাবরক্ষণ ও ট্যাক্সের কাজ করেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যেতাদের বাসার গৃহস্থালির কাজের প্রতিটির জন্য কত টাকা দেন। আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, তাদের এলাকায় প্রতি কাজের জন্য মাসিক ১ হাজার টাকা পরিশোধ করতে হয়। এই পার্থক্যের কারণ কী? কারণ হলো লিভিং কস্ট। দেখুন ঢাকার মধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় জীবনযাপন ব্যয়ে অনেক পার্থক্য রয়েছে। ঢাকা তো ঢাকা, মিরপুর ১ নম্বর সেকশন আর ১৪ নম্বর সেকশনের মধ্যে জীবন ধারনের ব্যয়ে কতটা পার্থক্য।

আসমা আপার কথায় আসি। আসমা আপা পাল্টা প্রশ্ন ছুড়লেন আমার স্ত্রীর 'সামান্য' একটি আবদারে। আমার স্ত্রী বলেছিলেন, যে পাঁচটি কাজের কথা বলা হয়েছে তার ভেতর শুধু আমাদের দুজনের জন্য নাশতা বানানোর সঙ্গে দুটি ডিম ভাজা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু আমাদের আরও তিনটি ডিম ভেজে দিতে হবে। কারণ, আমার দুই ছেলে ও শাশুড়ি মায়ের নাশতায় এটি দরকার। কিন্তু আসমা আপা তাতে রাজি নন। আমার স্ত্রীর কাছে এটি সামান্য বাড়তি কাজ, যা বিনা আয়াসেই সম্ভব! কিন্তু আসমা আপার যুক্তি হলো, আপনি তো ভাবছেন একটি দিনের কথা, কিন্তু আমার জন্য তো এটি সারা মাসে প্রতিদিন তিনটি করে ডিম ভাজতে কত সময় লাগবে, তার বিনিময়ে আমি কী পাব? তিনি আরও বললেন, এবার আপনি হিসাব করুন, আমি তো আর এক মাস কাজ করেই চলে যাব না, এই হিসাব বছরে করলে কী দাড়াবে? আসমা আপার যুক্তি অকাট্য। আমি এই অচলায়তন কাটানোর জন্য বললাম যে, তিনটি ডিম ভাজার বাড়তি কাজের জন্য আপনার সাড়ে তিন হাজার টাকার সঙ্গে কত যোগ করতে হবে? তিনি বললেন, এটি তো ৭০০ টাকার মতো একটি পূর্ণাঙ্গ কাজ নয়, তাই আমাকে মাসের টাকার সঙ্গে ৫০০ টাকা যোগ করে দিলেই চলবে। আমি সানন্দে রাজি হলেও আমার স্ত্রীর মনটা বেশ ভার। আমার কথা ছিল প্রতিটি শ্রমের এখানে বিনিময়মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে, ফলে এখানে বিনিময়মূল্য ছাড়া আসমা আপার একবিন্দু শ্রমও আমাদের আইনত তো নয়ই, কোনো অর্থেই চাওয়া যাবে না। আমার স্ত্রী অন্য একটি বাড়তি কথাও বলেছিল। আর তা হলো, ঘর ঝাড়ু ও ঘর মোছার কাজ, যেটি সেই পাঁচটি কাজের অন্তর্ভুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ কাজ ছিল, সেখানে বিছানা ঝাড়াকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আসমা আপা এটিও গ্রহণ করবেন না। তিনি বললেন যে, ঘর ঝাড়ু ও মোছার কাজ করার সময় আমি তো সোফা ঝাড়ু দিচ্ছিই, তার জন্য তো কোনো আলাদা দাম চাইনি, সেখানে আপনাদের বাসার তিনটি বেডরুমের তিনটি বিছানা ঝাড়ু দিতে হবে, তাতে আমার অন্য বাসার কাজের সময় ক্ষতিগস্ত হবে। তার এ কথাটিও খুবই শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমি বললাম সেটির জন্যও বেতনের সঙ্গে কত দিতে হবে? তিনি বললেন, সেটি আপনাদের বিবেচনা। আমি বললাম আপনার সঙ্গে মৌখিক ভিত্তিতে হোক আর লিখিত হোক, চুক্তি তো চুক্তিই। ঠিক হলো সর্বমোট সাড়ে ৪ হাজার টাকা তিনি বেতন পাবেন মাসে। আমি এর সঙ্গে আমাদের পক্ষ দুইবেলা (সকাল ও দুপুর বেলার) খাবার যোগ করে দিতে বললাম আমার স্ত্রীকে। যদিও আমাদের এলাকায় বাঁধা-সাহায্যকারী ছাড়া ছুটাসহায়তাকারীদের কেউ খাবার দেন না। তবু আমরা এমন সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ, তার পুষ্টির অভাব রয়েছে, দেখে বোঝা যায়। ফলে, এটুকু সাপোর্ট দিলে তিনি আনন্দের সঙ্গে কাজ করবেন, খুশি থাকবেন।

তথ্য, সমস্থিতি (ইকুইলিব্রিয়াম) ও ন্যায্যতা

কিন্তু ফ্ল্যাটমালিক হিসেবে আসমা আপার সঙ্গে একটি স্বতঃস্ফূর্ত চুক্তিতে পৌঁছাতে কোনো অসম ক্ষমতা-সম্পর্ক কাজ করেছে কিনা, সেটি অবশ্য অন্য প্রশ্ন। আমি আসমা আপার সঙ্গে এইমাত্র পাকা হয়ে যাওয়া নতুন চুক্তি, যা সেপ্টেম্বরের পহেলা তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে, তার ন্যায্যতা নিয়ে ভাবছি। যেমন আমার মনে আসছে যে, চুক্তির সঙ্গে কি ন্যায্যতার কোনো সম্পর্ক আছে? থাকলে সেটি কী? আসমা আপার থেকে যে বিষয়টি আমি শিখলাম, তা হলো যে ক্ষেত্রে আমরা কোনো বিষয়ে দরদাম করে একটি সমস্থিতি (ইকুইলিব্রিয়াম) বিন্দুতে আসি, তার জন্য বাস্তবতা ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ। তথ্য জানা বা না জানা এসবকে আমরা যতই 'অবহেলা' করি না কেন, এটিই শেষ দাগে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের গুণগত প্রভাব ফেলে। এর সঙ্গে অবশ্যই জড়িয়ে আছে নিজের জীবনমান ত্রে বটেই সঙ্গে অন্যরাও। আর বাজারে দরদাম করতে গেলে ভেতর দিয়ে নানা রকমের সমস্থিতি

(ইকুইলিব্রিয়াম) বিন্দু আমরা পেয়েই যাব, এটি অনেকটা যান্ত্রিক বিষয়, কিন্তু কোন সমস্থিতি বিন্দুটি অধিক ন্যায্য—অন্তত দুটি পক্ষের ভেতর—সেটি কিন্তু সমস্থিতি বিন্দু বিচার করতে পারবে না। অর্থাৎ সমস্থিতি বিন্দুর সঙ্গে ন্যায্যতা চিন্তার ফারাক রয়েছে।

যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে অদৃশ্য হস্তের (ইনভিজিবল হ্যান্ড) অনুপস্থিতি থাকলে বাজারের সাধারণ কার্যক্রম অসম্ভব হয়ে পড়বে। ফলে আমরা বিদ্যমান বর্তমানে আমাদের পণ্য ও সেবা পাওয়ার স্বাধীনতাটুকুও হারিয়ে ফেলব। ইন্টান্যশনাল ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও নোবেলজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের বিখ্যাত ছাত্র অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর সাম্প্রতিক লেখা থেকে জানতে পারি যে ২০০১ সালের নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎজ ও তাঁর দুই বন্ধু জর্জ আকেরলফ ও মাইকেল স্পেন্স তাঁদের যুগান্তকারী গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, বাজারে চলমান যে অসম তথ্যপ্রবাহ রয়েছে, তার ভিত্তিতে অদৃশ্য হস্ত বা ইনভিজিবল হ্যান্ড সঠিক বিন্দু দিতে পারে না। আর এর ফল গিয়ে পড়ে পণ্য ও সেবার গুণগত মানের ওপর। কিন্তু স্টিগলিৎজ ও তাঁর বন্ধুরা এর সঙ্গে এটি যোগ করেননি, অসম তথ্যপ্রবাহের ভিত্তিতে আমরা যেসব সমস্থিতি (ইকুইলিব্রিয়াম) বিন্দু সয়ংক্রিয়ভাবে পেয়ে যাচ্ছি, সেগুলোর বহিঃস্থ প্রভাবগুলো বা এক্সটার্নালিটিজ বিবেচনা কীভাবে করা যাবে। কারণ, অর্থনীতির কর্মকাণ্ড তো আর কেবল ব্যক্তিগত ভোগ ও অধিকারের ভেতরই সীমাবদ্ধ থাকে না, এটি সার্বিক জীবনমান, সমাজে মানুষে-মানুষে সম্পর্ক, ন্যায্যতার চর্চা ও একটি সার্বিক সহমর্মীভিত্তিক সংহত সমাজের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিবেচনার অভাবেই কি আজ আমাদের সমাজ ও শহরটি অনারামদায়ক, কিছুটা দিগ্‌ভ্রান্ত এবং কোথায় যেন মানুষের প্রতি আপসহীন একটা ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সামাজিক চুক্তি ও ন্যায্যতা

স্কুলে থাকতে ছেলেবেলা থেকেই পড়ে এসেছি, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। কিন্তু জানতাম না কেন মানুষ সমাজে থাকে? একত্রে থাকতে গেলে কি কোনো লিখিত বা অলিখিত বোঝাপড়া কিংবা চুক্তি করতে হয়? সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানের জন্য ন্যায্যতা ছাড়া একত্রে বসবাস সম্ভব নয়। তাহলে ন্যায্যতার প্রসার কীভাবে ঘটানো যাবে? ন্যায্যতার পরিধি বাড়াতে গেলে সামাজিক চুক্তির সীমিত কাঠামোটির বাইরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা কী রয়ে গেছে?

তত্ত্বের কাজ হলো বাস্তবে প্রচ্ছন্নভাবে থাকা বিষয়টিকে যুক্তি ও সংবেদনশীলতার মাধ্যমে পরিচ্ছন্নভাবে মানুষের চেতনায় ফুটিয়ে তোলা। ফলে এ প্রক্রিয়া আমাদের বাস্তবতাকে নতুন আঙ্গিকে বুঝতে সহায়তা করে। আর এর ফলেই একদিকে আমাদের যেমন বাস্তবতার নতুন মাত্রা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়, তেমনই বাস্তবতার কাম্য রূপান্তর সহজতর হয়। আমরা যদি একটু বড় প্রেক্ষাপটে গৃহস্থালি কাজের চুক্তি নিয়ে ভাবি, তবে আমাদের চোখে কেমন ঠেকবে তা দেখা যাক। এই ঘটনায় দুটি পক্ষ—আমার পরিবার একটি পক্ষ এবং আসমা আপার পরিবার অন্য একটি পক্ষ। গৃহস্থালি কাজের যে চুক্তি হচ্ছে, তার ভেতরে উভয়পক্ষেরই জীবনমানের প্রশ্নটি রয়ে গেছে। তবে এই মুহূর্তের জীবনমানকে অন্তিম অবস্থা না ধরে আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে কিছু প্রশ্ন তুলতে পারি।

আসমা আপা ও তার পরিবার যেভাবে জীবন কাটাতে চায়, সেভাবে জীবনটি কাটাতে পারছে কি না। এই চুক্তি তার কেবল বর্তমান স্বাধীনতা, সক্ষমতা কিংবা সক্ষমতাই নয় ভবিষ্যতের একটি বিকশিত জীবনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কিনা, যা তার ও তার পরিবারের অধিক ন্যায্যতা ও অধিকারকে নিশ্চিত করতে পারবে। সমস্যায় পড়লে অর্থাৎ চুক্তির শর্ত অপর পক্ষ ভঙ্গ করলে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান তাকে

সুরক্ষা দিতে পারে, সেটি তিনি জানেন কিনা। কেবল প্রতিষ্ঠানই নয়, প্রতিষ্ঠানের বাইরেও তার অধিকারগুলো সংরক্ষণের কোনো পথ-পদ্ধতি তার জানা আছে কি না। অধিকন্তু চুক্তিতে নেই কিংবা আলোচনাও হয়নি এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা গৃহস্থালি কাজের সহায়তাকারীর ক্ষেত্রে ভাবার 'সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র' এখনো প্রস্তুত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ আসমা আপার মত প্রকাশের স্বাধীনতায় আমার পরিবার (গৃহকর্তা হিসেবে) কতখানি ছাড় দিতে প্রস্তুত সেটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে গৃহকর্তার পরিবারের কতটুকু গুণগত শিক্ষা রয়েছে, যার ফলে মানসিকভাবে অন্যের প্রতি তার উদারতা ও সম্মানের স্থিতিস্থাপকতা কতটুকু হবে সেটি নির্ভর করবে। গৃহস্থালি কাজ করতে গিয়ে কোনো ধরনের সমস্যায় পড়লে তার গৃহকর্তার পরিবারের সঙ্গে অলোচনার সুযোগ কতখানি রয়েছে, তাও বিবেচ্য বিষয়। আসমা আপার ক্ষমতায়নের জন্য তিনি নিজের তথ্যভিত্তি তথা জ্ঞানভিত্তি বাড়ানোর পথ খুঁজে নেবেন কীভাবে?

যুক্তিনির্ভর প্রকাশ্য আলোচনা ও ন্যায্যতা

বাঙালি সংস্কৃতি তো বটেই, পুরো উপমহাদেশেই অন্ধবিশ্বাস ও অযৌক্তিকতার চেয়ে যুক্তিনির্ভর প্রকাশ্য আলোচনার অত্যন্ত শক্তিশালী ধারা বহমান। কেবল ভারতবর্ষেই নয় আফ্রিকা, চীন, মিসরীয় অঞ্চলসহ নানা অ-পশ্চিমা সমাজেও যুক্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ চিন্তার বিকাশ ঘটেছে। পশ্চিমা লেখাপত্র যেহেতু আমরা বেশি পড়ি, সেকারণে ন্যায্যতার আলোচনাকে পশ্চিমা ও অতি সাম্প্রতিক বিষয় মনে হতে পারে। আমার কাছে এ চিন্তাধারাকে একটি ফাঁদ বলে মনে হয়। কারণ, আমি মনে করি—আজ আমরা যেসব ভাবনা-চিন্তাকে পশ্চিমা বলে চিহ্নিত করছি, সেসব জ্ঞানের কোনো না কোনো পর্যায়ের উন্নয়নে পৃথিবীর অ-পশ্চিমা সমাজের অবদানকে গ্রহণ করেই সমৃদ্ধ হয়েছে। ফলে বিশুদ্ধ পশ্চিমা সভ্যতা বলে কিছু নেই। আবার উল্টোদিকে, বিশুদ্ধ অ-পশ্চিমা জ্ঞান বলেও কিছু হয় না। কারণ, অ-পশ্চিমা সমাজও পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই নিজেদের পরিপুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে কার্যত পশ্চিমা ও অ-পশ্চিমা জ্ঞানের মধ্যে আমরা কোনো স্পষ্ট ভেদরেখা টেনে আলাদা করতে পারছি না।

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জ্ঞানের ভূমিকা

এই জায়গায় এসে আমার থমাস জেফারসনের কথা মনে পড়ে গেল। জেফারসনের কথা পাড়ামাত্রই অনেকে শোরগোল শুরু করে দিতে পারেন। তাঁর দাস ব্যবসা ও ইত্যাদি বিষয় টেনে আনতে পারেন। আসলে এখন ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের পক্ষ নিয়ে কিছু বলবার আগে দুবার ভাবতে হয়, অথচ আমাকে সেটাই করতে হচ্ছে। জেফারসনের প্রতি আমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ বেশ প্রগাঢ়। আমি মনে করি, জ্ঞানের বিষয়ে তাঁর দার্শনিক দূরদৃষ্টি এখনো আকর্ষণীয়, যদিও তিনি ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ। তিনি জ্ঞান নিয়ে যে গভীর দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তা আমাকে ভীষণ উদ্দীপ্ত করেছে। আমি তার কথাটি পেয়েছিলাম বিখ্যাত 'দ্য ইকোনমিস্ট' ম্যাগাজিনে। জেফারসনের কথাটি ছিল, জ্ঞান আহরণে কোনো বাধা নেই। যে-কেউই জ্ঞানার্জন করতে পারে। জ্ঞানের কোনো নির্দিষ্ট পরিধিও নেই। কোনো একজন বা কোনো সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী এর মালিক নন কিংবা জ্ঞানের কোনো একক মালিকানা দাবি করা সম্ভব নয়। কারণ, জ্ঞানের এই বিপুল ভান্ডার গড়তে পৃথিবীর নানা প্রান্তের সমগ্র মানবসভ্যতাই অবদান রেখেছেন। আমাদের প্রত্যেকের শ্রম-জ্ঞানের উৎকর্ষতায় অবদান রেখেছে। এর ফলে কার্যত সমগ্র পৃথিবীই এই প্রক্রিয়ায় সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে পেরেছে। জেফারসনের ভাষায়: 'যদি প্রকৃতি কোনো একটিমাত্র বস্তুকে এমন সমৃদ্ধ করে সৃষ্টি করে থাকে, যা অন্য সব সম্পদের তুলনায় সবচেয়ে সংবেদনশীল, তবে সেটি হলো চিন্তার সক্ষমতা ও তার প্রয়োগ; যাকে আমরা আইডিয়া বা ধারণা বলে চিহ্নিত করি।... কোনো

একজন কতখানি জ্ঞানার্জন করতে পারবেন তার পরিধি কেউই নির্ধারণ করে দিতে পারেন না। আর যদি কেউ এমন চেষ্টা করেন, তবে তিনি কখনোই সফল হবেন না। কারণ, বাদবাকি সবাই মিলিতভাবে সমগ্র জ্ঞানভান্ডারের মালিকানার অধিকারী। যদি কোনো একজন আমার থেকে কোনো একটি আইডিয়া পেয়ে যান, তবে তিনি আমার জ্ঞানের ভান্ডারকে না কমিয়েই নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারেন। ব্যাপারটি হলো অনেকটা এমন—কোনো একজন আমার দিকে যদি টর্চলাইটের আলো ফেলেন, তবে শেষপর্যন্ত তিনি আমাকে তো আলোকিত করলেনই,অধিকন্তু আমাকে আলোকিত করার জন্য আলোর প্রতিফলনের মাধ্যমে তিনি নিজেকেও আলোকিত করতে সক্ষম হবেন। যদিও এতে আমি নিজে অন্ধকারে ডুবে যাব না। বাস্তবে জ্ঞান ও আলোকরশ্মি একইরকমভাবে কাজ করে।"

খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি বনাম অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি

অমর্ত্য সেনের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ "হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড" ("স্মৃতিকথা: ঘরে-বাইরে")-এর মুখবন্ধে তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাই। অমর্ত্য সেনের ভাষায়: 'পৃথিবীর সভ্যতা ব্যাখ্যায় দুটি ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। একটি ধারার দৃষ্টিভঙ্গি হলো "খণ্ডিত"। এই দৃষ্টিকোণটির আওতায় বিভিন্ন সময়ের সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও তার প্রকাশভঙ্গিগুলো আলাদা আলাদা সভ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই পদ্ধতির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন সময়ের সভ্যতার অংশগুলোর মধ্যে প্রতিকূল সম্পর্ক দেখানো হয়। বর্তমান সময়ে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বেশ প্রচলিত যেটি "সভ্যতার সংঘাত" নামে আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে। আর অন্য ধারাটি হলো "অন্তর্ভূক্তিমূলক" দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিকোণ মনোযোগী হয় বিভিন্ন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশভঙ্গিগুলো চূড়ান্তভাবে একটি সভ্যতার অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করায়—এটিকে বিশ্বসভ্যতা নাম দেওয়া যায়। এই বিশ্বসভ্যতার গাছটি সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র মানবজাতির পরস্পরসম্পর্কিত আন্তজীবন যাপনের মাধ্যমে, বিভিন্ন জায়গায় তার শেকড় ও শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়ে, নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় ফুল ফুটিয়ে। নিশ্চিতভাবেই আমার এ গ্রন্থটি যদিও সভ্যতার প্রকৃতির যুক্তিসিদ্ধ অনুসন্ধানে নিবেদিত নয়, কিন্তু পাঠক হিসেবে আপনি দেখবেন—পৃথিবীর যা-কিছু অবদান, তার ব্যাখ্যায় খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে বরং সভ্যতার অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আমার সহমর্মিতা রয়েছে। মধ্যযুগের ক্রুসেড থেকে শুরু করে বিগত শতকের নাৎসিদের আক্রমণ, ধর্মীয় রাজনীতির যুদ্ধ-বৈরী অবস্থা থেকে সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা ও দাঙ্গার সৃষ্টি, বিভিন্ন ধরনের গোঁড়া মতের গোষ্ঠীগুলোর ভেতর রেষারেষিও ঝগড়া। কিন্তু এসব হিংসা ও সংঘাত থাকা সত্ত্বেও এর বিরুদ্ধে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার শক্তিশালী ধারাও বহমান ছিল। আমরা যদি ভালোভাবে লক্ষ করি তবে বুঝতে পারব যে, একটি গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীতে কীভাবে জ্ঞান সঞ্চারিত হয় এবং এক দেশ থেকে অন্য আরেকটি দেশে বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটে। সভ্যতার এই পারস্পরিক বিনিময়ের পথ ধরে হাঁটতে থাকলে আমরা দেখব, বৃহত্তর ও সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির কাহিনীগুলো আমরা কিছুতেই এড়াতে পারছি না। পারস্পরিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে আমাদের সক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলার গুরুত্বকে কিছুতেই খাটো করে দেখা যায় না। চিন্তাশীল সত্তা হিসেবে মানুষ হলো গঠনমূলক অভিজ্ঞতার বিশাল এক ভান্ডার। এক হাজার বছর আগে, প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে ও ১১ শতকের প্রথম দিকে ইরানি গণিতজ্ঞ আল-বেরুনি বেশ কিছু বছর ভারতে ছিলেন। তাঁর সুলিখিত "তারিখ আল-হিন্দ" গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেন যে, পরস্পরের কাছ থেকে শেখার বিষয়টি সমৃদ্ধ জ্ঞান ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে কতটা সহায়ক হিসেবে কাজ করে। তিনি ভারতে থেকেই গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে চমৎকার সব অবদান রেখে গেছেন। সেটি কম দিনের কথা নয়,

আজ থেকে প্রায় এক সহস্রাব্দ বছর আগেই তিনি দেখিয়েছেন যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের ভেতর দিয়ে কীভাবে জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তোলা যায়। ভারতীয়দের প্রতি আল-বেরুনির ভালোবাসা ভারতীয় গণিতশাস্ত্র ও বিজ্ঞানে তার আগ্রহকে একদিকে যেমন বাড়িয়ে তুলেছে, ঠিক তেমনই এটিই ভারতীয় এসব শাস্ত্রে তার নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিশ্ববীক্ষার বিসর্জন

ন্যায্যতা, সমদর্শিতা (ফেয়ারনেস), দায়িত্ব (রেসপনসিবিলিটি), কর্তব্য (ডিউটি), শুভময়তা (গুডনেস) ও সমীচীনতা (রাইটনেস) এসব গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলোর চর্চার নানা ধরন বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে চিন্তার চর্চা বরং বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বাংলাদেশের জন্য যা দরকারি সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক চিন্তা-চর্চা তার সহায়তা করতে পারছে না কিংবা করছে না। রাষ্ট্র পরিচালনায় কতখানি অসহযোগিতা করা যায়, তার উদাহরণ রয়েছে অনেক।

উদাহরণস্বরূপ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পশ্চিমা চিন্তকদের সমালোচনা নিত্যকার ব্যাপার, যুগের চাহিদা। এটি একধরনের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। আমার কাছে ফ্যাশন অর্থ পুরোনো চিন্তা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে বিপুল পরিমাণ সময় ও শ্রম ঢালা হয় উত্তর-উপনিবেশিক ও উত্তরাধুনিক তত্ত্ব চর্চা এবং নানা ধরনের অপ্রয়োজনীয় জিনিসে, সেগুলো কোমলমতি তরুণ-তরুণীদের মনকে সংকীর্ণ করে ফেলছে। ফলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী তৈরি করতে পারছে না। খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানমনস্ক হচ্ছে না। বিজ্ঞান ও কলা চর্চার পরিসর বিশ্ববিদ্যালয়েই সংকুচিত হচ্ছে। গরিব আত্মীয়কে জায়গা দিতে যে রকমভাবে তেমন কোনো পয়সা খরচ হয় না, সেরকমভাবে বিজ্ঞান ও মানবিক অনুষদকে কোনো রকমে জায়গা দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিসরে। জ্ঞানের সক্রিয় কর্মী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরকে এখন দেশের চাহিদা মেটাতে চিন্তাশীল ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারছে না। ফলে বিশ্ববীক্ষা নিয়ে নতুন প্রজন্মের গড়ে তোলার ব্যর্থতা সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এই ব্যর্থতা আমাদের সামষ্টিক স্বাধীনতা ও সক্ষমতাকে ক্রমবর্ধমানভাবে প্রসারিত করার কাজটিকে চরমভাবে বাধাগ্রস্থ করতে পারে। এই সবকিছুর উৎস কী, তা উপরের আলোচনাতে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি।

সভ্যতার নির্মাণ কীভাবে?

উদাহরণস্বরূপ মহামতি গৌতম বুদ্ধের কথা বলা যায়। তাঁর সময়টি ছিল খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভারতবর্ষ। আমরা যদি ইউরোপীয় আলোকায়নের প্রধান চিন্তকদের লেখার সঙ্গে বুদ্ধের চিন্তাধারাগুলো পাশাপাশি রেখে তুলনা করি, তবে দেখব যে তারা বিপরীত চিন্তার তো ননই, বরং তাদের চিন্তাভাবনার অনেক সাদৃশ্য ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যে মিল রয়েছে। এমনকি গৌতম বুদ্ধের নামের শেষাংশ বুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ হলো যিনি আলোকপ্রাপ্ত। ইতিহাস ঘেঁটে আমরা দেখছি, একই ধরনের জ্ঞানচর্চার ধরন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানা স্তরে দেখতে পাওয়া যায়। একই ধরনের প্রশ্ন মোকাবিলায় যুক্তি প্রয়োগের ধাঁচ আলাদা হলেও মূলত তাদের ভেতরে প্রবাহমান সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত না করি তবে সমগ্র সভ্যতার জ্ঞানভান্ডারের অগ্রসরতা আমাদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। আবার নানা ধাঁচের যুক্তি প্রয়োগকে যদি কেবল আঞ্চলিক পরিধিতে আটকে রাখি; তবে ন্যায্যতা, সমদর্শিতা, দায়িত্ব, কর্তব্য, শুভময়তা ও সমীচীনতাসংক্রান্ত যুক্তিচর্চা ও প্রয়োগের অনেক সাধারণ সূত্র বুঝতে আমরা ব্যর্থ হব।

উপমহাদেশে নীতি ও ন্যায্যতার চর্চা

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের বিচারব্যবস্থায় দুটি বিষয়ের সঙ্গে ন্যায্যতাসম্পর্কিত বলে মনে করা হতো। একটি হলো নীতিসম্পর্কিত ধারণা ও অপরটি হলো ন্যায়সম্পর্কিত ধারণা। কোনো প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ও চর্চা সমীচীনতার বিবেচনায় উত্তীর্ণ হতে পারল কিনা এবং আচার-আচরণ ঔচিত্যের বিচারে সঠিক ছিল কিনা—এ দুটি বিষয় ছিল নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ও চর্চার পরিণামগুলোর মূল্যায়ন– অর্থাৎ এর ফলে মানুষের জীবনযাপনে এর ফলাফল কেমন, তার বিবেচনাগুলো ছিল ন্যায় ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে এদুটি বিষয় বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

অন্যদিকে আলোকায়নের চিন্তকেরা কিন্তু সবাই এক সুরে কথা বলেননি। তাদের মধ্যে ন্যূনতম দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়। পুরোপুরি ন্যায্য সমাজের বাস্তবায়ন কীভাবে হবে, সেটি চিহ্নিত করার ওপর জোর দিয়েছেন একটি ধারার চিন্তকেরা। এই ধারায় তারা সমাজে ন্যায্য প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণাগুণ নির্ধারণেই জোর দিয়েছেন। এই ধারাতেই টমাস হবস সামাজিক চুক্তির ধারণাকে সামনে আনেন। এ চিন্তাধারার সমূহ উন্নতি ঘটান পরবর্তী সময়ে জন লক, জ্যাঁ-জাক রুশো, ইমানুয়েল কান্টসহ অন্যরা।

চুক্তিমূলক ন্যায্যতা বনাম অচুক্তিমূলক ন্যায্যতা

সমকালীন রাজনৈতিক দর্শনে চুক্তিমূলক (কন্ট্রাকটারিয়ান) দৃষ্টিভঙ্গিটির জোরালো প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় জন রলসের ন্যায্যতা তত্ত্বে। ন্যায্যতাসংক্রান্ত অন্য ধারাটির চিন্তকদের কথা ছিল জীবনযাপনের বিভিন্ন ধারায় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব থাকলেও মানুষের আচরণ, সামাজিক আদানপ্রদান ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক চলকগুলোর প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ মানুষের বাস্তব জীবন যেসব নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়, তাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা। এই ধারার চিন্তকদের মধ্যে রয়েছেন অ্যাডাম স্মিথ, মারকি দ্য কনদরচে, মেরি উলস্টোনক্রাফট, জেরেমি বেন্থাম, কার্ল মার্কস, জন স্টুয়ার্ট মিলসহ আরও বেশ কিছু দার্শনিক—যাঁরা নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার মধ্যেও সাধারণ সুরটি ছিল সামাজিক চুক্তির ধারণাটি তো কাল্পনিক, নইলে বাস্তব সমাজে শ্রেণি, বৈষম্যের ধারা, অধস্তন শ্রেণির ওপর সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা ও অসমতা নিরন্তর ঘটে চলেছে কীভাবে? সামাজিক চুক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতি ও ন্যায্যতা বাস্তবে কাজ করলে, এসব ঘটছে কেন? ফলে এই ধারার চিন্তকেরা অচুক্তিমূলক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারায়তাঁদেরচিন্তাভাবনাগুলোকে পরিচালিত করেছেন। তবে এক্ষেত্রে "সামাজিক চয়ন তত্ত্ব"র কথা না বললেই নয়। অষ্টাদশ শতকে মারকি দ্য কনদরচে সামাজিক চয়ন তত্ত্বের নির্মাণ করেন, যেটি ছিল মূলত গাণিতিক ধারা। বিংশ শতকের মধ্য ভাগে কেনেথ অ্যারো এই তত্ত্বের সমূহ উন্নতি ঘটান। তবে এই তত্ত্বের শিরোনাম দেখে আলোকায়নের প্রথম ধারার মনে হলেও এটি মূলত দ্বিতীয় ধারার মধ্যে পড়ে।

রলসের আদি অবস্থার (অরিজিনাল পজিশন) ধারণা

জন রলসের ন্যায্যতাকে সমদর্শিতার ভিত্তিতে বোঝার তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে 'আদি অবস্থা'র ধারণার কথা বলেছেন। অর্থাৎ রলসের সমদর্শিতার তত্ত্ব 'আদি অবস্থা'র ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'আদি অবস্থা'র কিছু কিছু সীমাবদ্ধতার উত্তরণেও স্মিথের নিষ্পক্ষতার চিন্তাটি জরুরিভাবে দরকার হয়ে পড়বে। রলসের 'অরিজিনাল পজিশন' বা 'আদি অবস্থা' একটি কল্পিত পরিস্থিতি, যেখানে সমাজের সবাই অজ্ঞানতার চাদরে ঢাকা থাকে। ব্যক্তিগত জীবনের স্বার্থ সম্পর্কে সবাই সেখানে উদাসীন এবং কেউই জানে না যে

ভালো জীবন কাকে বলে। এমন কথা আপনাদের মনে কৌতুকের সৃষ্টি করলেও রলসকে এভাবে প্রারম্ভিক প্রস্থানের (পয়েন্ট অব ডিপার্চার) চিন্তনকণা সৃষ্টি করেই এগোতে হয়েছিল। যদিও এই পরিস্থিতি সৃষ্টির পটভূমিটি কৃত্রিম, রলসের নিজেরই কল্পিত, তবে রলস এর ভিত্তিতে ন্যায্যতার এক মৌলিক ভিত্তিভূমি সৃষ্টি করেছেন। শুধু তা-ই নয় সূত্রগুলোকে বেশ শক্ত গাঁথুনিতে আঁটতে পেরেছেন। এর ভিত্তিতেই কেবল ন্যায্যতা সামনে এগোতে পারে। আর এই ন্যায্যতার ভিত্তিতেই সমাজে প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি হবে ও চলবে। এবং এরই ভিত্তিতে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ন্যায্য সমাজের সন্ধান পাওয়া যাবে।

চুক্তিমূলক (কন্ট্রাকটারিয়ান) ন্যায্যতা

রলসের চিন্তাপদ্ধতি মূলত চুক্তিমূলক (কন্ট্রাকটারিয়ান)। আদি অবস্থায় সবাই সর্বসম্মতভাবে কোন ধরনের 'সামাজিক চুক্তি' গ্রহণ করবেন সেটি রলসের চিন্তায় স্পষ্ট নয়। দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) তাঁর বহুল আলোচিত "ক্রিটিক অব প্রাকটিক্যাল রিজন" গ্রন্থে প্রথম এই চুক্তিনির্ভর চিন্তাপদ্ধতির ধারাণাটি আমাদের দেন। তবে বর্তমান সময়ে চুক্তিমূলক চিন্তাপদ্ধতির প্রভূত উন্নতি সাধনে নেতৃত্ব দেন জন রলস। ফলে সমকলীন নৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শনে চুক্তিমূলক ভাবনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রলসের "সমদর্শিতাই ন্যায্যতা" তত্ত্বের ধারণাটি মূলত চুক্তিমূলক ভাবনার ঐতিহ্যের কাঠামোই অনুসরণ করেছে। রলস 'আ থিওরি অব জাস্টিস' গ্রন্থে এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন: "লক, রুশো, এবং কান্ট প্রস্তাবিত সামাজিক চুক্তির ধ্রুপদী তত্ত্বটিকে বৃহত্তর রূপ দেওয়া এবং তাকে বিমূর্ততার উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা"—এটাই তাঁর লক্ষ্য।

চুক্তিমূলক ন্যায্যতাসমালোচনা

অমর্ত্য সেন রলসের এই ধারাটিকে তৃপ্তিযোগবাদী তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করার প্রয়াশটিকে সমালোচনা করেছেন। অমর্ত্য সেনের মতে, 'এই গুরুত্বপূর্ণ তুলনাটি আমাদের গভীরভাবে ভাবায়। কিন্তু শুধু এই বৈপরীত্যের ওপর জোর দেওয়ার ফলে রলস অন্য নানা চিন্তাধারাকে অবহেলা করেছেন, যে ধারাগুলো তৃপ্তিযোগবাদী নয়, অবার চুক্তিমূলকও নয়। আবার আমরা অ্যাডাম স্মিথের দৃষ্টান্তটি নিতে পারি। ন্যায্যতার দাবিকে সমদর্শিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি তাঁর (স্মিথের) "নিষ্পক্ষ দর্শক"-এর ধারণাটি ব্যবহার করেছিলেন।... স্মিথের নিষ্পক্ষ দর্শকের ধারণা ব্যবহার করে সমদর্শিতার প্রশ্নটি আলোচনা করলে এমন কিছু সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়, রলসের চুক্তিমূলক বিশ্লেষণের ধারায় যার অবকাশ নেই। আমরা এমন সম্ভাবনাগুলো বিচার করতে পারি: (১) কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থার অন্বেষণ না করে তুলনামূলক মূল্যায়ন; (২) কেবল প্রতিষ্ঠান এবং সূত্রাবলির হিসাব না নিয়ে সামাজিক পরিণামের প্রতি নজর দেওয়া; (৩) সামাজিক মূল্যায়নে অসম্পূর্ণতার সম্ভাবনা রেখে দিয়েও সামাজিক ন্যায্যতাসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে পথনির্দেশ দেওয়া, বিশেষত যেখানে অন্যায়ের স্বরূপ স্পষ্ট ও সহজবোধ্য; (৪) যারা চুক্তির শরিক, সেই ব্যক্তিবর্গের বাইরে অন্যদের মতামত জানা, সেটা তাদের স্বার্থকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যই হোক কিংবা স্থানীয় সংকীর্ণতায় আবদ্ধ থাকতে না চাওয়ার তাগিদেই হোক।... এই সমস্যগুলোর প্রত্যেকটিই চুক্তিমূলক ধারা এবং রল্সের "সমদর্শিতাই ন্যায্যতা"র তত্ত্বকে সীমিত করে।' (নীতি ও ন্যায্যতা, পৃ. ৯৩-৯৪)।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি, জন রলসের ন্যায্যতার তত্ত্ব সমদর্শিতার ভিত্তির ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আর এই সমদর্শিতার তত্ত্বটি নির্মাণ করেছেন 'আদি অবস্থা'র ধারণার ভিত্তিতে। এখন প্রশ্ন

হচ্ছে, রলসের কাছে কোন মানুষগুলো এসব প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন? সামাজিক চুক্তির যেসব নানা ধরনের রূপ সমাজে দেখা যায়, তাতে পৃথিবীর সব দেশের মানুষ এত অংশ নিতে পারবেন না। অমর্ত্য সেন রলসের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অমর্ত্য সেন বলেন: "রলস সামাজিক চুক্তির যে রূপটি ব্যবহার করেছেন, তার ফলে কেবল একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মানুষ ন্যায্যতার সন্ধানে যোগ দিতে পেরেছে, তিনি যাদের জনসমুদয় (পিপল) নামে অভিহিত করেছেন। সমকারীন রাজনীতির তত্ত্বে একটি জাতি-রাষ্ট্রের মানুষকে যেভাবে অভিহিত করা হয় তার সঙ্গে এর একটা সামগ্রিক সাদৃশ্য রয়েছে। (রলস) আদি অবস্থার ধারণাটি এর বাইরে যাওয়ার প্রায় কোনো উপায়ই রাখেনি। ...টমাস পোগে এবং আরও কেউ কেউ যেমন রলসের আদি অবস্থাকে 'বিশ্বজনীন' একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রল্‌সের পথ ধরে একটা বিশ্বায়িত সমাজের জন্য ন্যায্য প্রতিষ্ঠান তৈরি করার (যেমন, একটা বিশ্বায়িত সরকার গড়ে তোলার) প্রকল্পটি নিয়ে গভীর সমস্যা আছে। ... টমাস নেগেলের মতো তাত্ত্বিকেরা বিশ্বায়িত ন্যায্যতার ধারণাটিকেই অসম্ভব বলে রায় দিয়েছেন। অথচ একটি দেশে সামাজিক অবস্থার ন্যায্যতার মূল্যায়ন করতে হলে কোনো দেশের সীমানার বহির্ভূত বৃহত্তর বিশ্ব প্রাসঙ্গিক হতে বাধ্য। তার অন্তত দুটি কারণ আছে।... প্রথমত, একটা দেশে কী হচ্ছে, সেই দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে কাজ করছে, বাকি পৃথিবীর ওপর তার প্রভাব পড়বেই।...আমরা এই পরস্পরিক প্রভাবের বলয়েই বেঁচে আছি। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি দেশ বা সমাজেই কিছু স্থানীয় এবং সংকীর্ণ চিন্তাভাবনা থাকতে পারে, যেগুলো বৃহত্তর দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা এবং পর্যালোচনা করা দরকার হয়। কারণ, সেই পর্যালোচনার সূত্রে অনেক নতুন ধরনের প্রশ্ন উঠতে পারে, এবং একটা দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেসব কথা ধরে নিয়ে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক বা নৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, অন্য দেশ বা সমাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যায়, সেগুলোর সত্যতা যাচাই করা যায়।" (নীতি ও ন্যায্যতা, পৃ. ৯৪-৯৫)।

আইসায়া বার্লিন অমর্ত্য সেনের সঙ্গে এক আলোচনায় রলসের তত্ত্ব নিয়ে একটি গুরুতর প্রশ্ন তুলেছিলেন। বার্লিনের প্রশ্নটি ছিল: "'সমদর্শিতাই ন্যায্যতা" ধারণাটি যথেষ্ট মৌলিক ধারণা হতে পারে না, কারণ পৃথিবীর বেশ কয়েকটি প্রধান ভাষায় এই দুটি শব্দের সাবতন্ত্র প্রতিশব্দই নেই। যেমন ফরাসি ভাষায় "ন্যায্যতা" দিয়েই দুটি ধারণা বোঝাতে হয়।' অমর্ত্য সেন বার্লিনের প্রশ্নটি একটি চিঠিতে লিখে রলসকে জানান। রলস চিঠিটি পেয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধিদীপ্তির সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন। রলসের জবাবটি ছিল: 'বিশেষ বিশেষ এবং অর্থের দিক থেকে সুনির্দিষ্ট শব্দ একটি ভাষায় আছে কি না, সেটা এখানে খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়; আসল প্রশ্ন হলো—নির্দিষ্ট শব্দ না থাকলেও সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে বুঝে নিতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয় কিনা, এবং তারা প্রয়োজন ও প্রসঙ্গ অনুসারে যত শব্দ দরকার তত শব্দই ব্যবহার করে ধারণাগুলোকে স্পষ্ট করে বোঝাতে পারেন কি না।'

ন্যায্যতা প্রশ্নে রলস ও স্মিথের সমন্বয়

এখন প্রশ্ন হচ্ছে রলস কেন 'আদি অবস্থা'র ধারণা নির্মাণে অজ্ঞানতার চাদরে ঢাকা জনগোষ্ঠীর কথা বলেছেন? কারণ, সেই গোষ্ঠীর সদস্যরা যেন কায়েমি স্বার্থ ও ব্যক্তিগত নানা ধরনের প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। কিন্তু অ্যাডাম স্মিথের নিষ্পক্ষ দর্শক ধারণাটির অর্থ হলো 'মানবসমাজের বাকি অংশের চোখ' দিয়ে পরিস্থিতির নিরপেক্ষ মূল্যায়ন নিশ্চিত করা। আমার মতে, একটি ন্যায্য সমাজের নির্মাণে নির্মোহ থাকার আন্তরিকতার কোনো অভাব আমরা রলস ও স্মিথের মধ্যে পাই না বরং উদ্দেশ্যের দিক থেকে যথেষ্ঠ মিল আছে এমনটিও বলা যায়। তা সত্ত্বেও রলস তাঁর অজ্ঞানতার চাদরে ঢাকা জনগোষ্ঠীকে

পৃথিবীর বাদবাকি জনগোষ্ঠীর মূল্যায়নের বাইরে রেখেছেন। অর্থাৎ রলসীয় তত্ত্বে অন্যদের অংশগ্রহণের যে স্বাধীনতাটি নেই, স্মিথের নিষ্পক্ষ দর্শক বা ইম্পারশিয়াল স্পেকটেটরের ধারণাটি অনেকখানি স্থিতিস্থাপক (ফ্লেক্সিবল)। স্মিথের চিন্তার এই শক্তিশালী দিকটি আমাদের রলসের তত্ত্বীয় সীমাবদ্ধতা অতিক্রমে উৎসাহ দেয়। তাসত্ত্বেও 'বাকি লোকদের' চোখ দিয়ে কী দেখা সম্ভব হবে, সে জন্য মুক্তমনের প্রয়োজন—এই প্রসঙ্গটিতে স্মিথের বক্তব্যগুলো রলসের তত্ত্ব বাতিল না করে বরং সমর্থনই করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, চুক্তিমূলক ন্যায্যতার ভেতর যে যুক্তিপ্রয়োগের বিষয়টি কীভাবে কাজ করে তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। অ্যাডাম স্মিথের ইম্পারশিয়াল স্পেকটেটর বা নিষ্পক্ষ দর্শক ধারণাটি ব্যবহারের সঙ্গে চুক্তিমূলক যুক্তিপ্রয়োগের সম্পর্ক রয়েছে। ন্যায্যতার ভেতর সমদর্শিতা কাজ করছে কিনা, তা নিশ্চিত হতে আমরা যেকোনো লোকের মত আহ্বান করার মতো স্থিতিস্থাপক (ফ্লেক্সিবল) থাকতে হবে। কিন্তু সমস্যা হলো চুক্তির ভেতর আপস-মীমাংসার ক্ষেত্রে সমদর্শিতা অনেক সময় রক্ষা করা যায় না। কারণ, নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্যদের ভেতরই সেটি সীমিত থাকে, অথবা যেসব ব্যক্তির ভেতর চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে সেখানকার 'বদ্ধ নিষ্পক্ষতা'র কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কেউ এখানে চুক্তি সম্পাদনে স্বাক্ষীর কথাটি তুলতে পারেন। কিন্তু সমস্যা হলো একই জনগোষ্ঠী বা সংস্কৃতির সদস্য থেকে স্বাক্ষী হওয়ায় 'বদ্ধ নিষ্পক্ষতা'কে 'মুক্ত নিষ্পক্ষতা'য় রূপান্তরিত করার অনেক বাধা থেকেই যায়। মোদ্দা কথাটি হলো, সমসাময়িক সময়ের হবসীয় চিন্তাবিদ রলস ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় বিশুদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলায় মনোযোগী। কিন্তু এধরনের প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম রাষ্ট্রে কাজ করতে পারবে, তখনই যখন সমাজটির অস্তিত্ব থাকবে ন্যূনতম দুটি মৌলিক বিষয়কে কেন্দ্র করে। প্রথমটি হলো—সমাজের সদস্যদের ভেতর সামাজিক চুক্তি থাকতে হবে এবং দ্বিতীয়টি হলো—সমাজের সদস্যদের ভেতর সম্পূর্ণ মতৈক্যের ভিত্তি থাকতে হবে। রলসের 'আ থিওরি অব জাস্টিস' গ্রন্থেই একথার সমর্থন পাওয়া যায়: "এটি খুবই সম্ভব যে, একজন প্রকৃত বিচারশীল ও নিষ্পক্ষ দর্শক কেবল সেই সমাজব্যবস্থাকেই সমর্থন জানাবেন যেটি ন্যায্যতার সূত্রগুলোকে গ্রহণ করে, এবং সেগুলো আবার একটি চুক্তির মাধ্যমে গৃহীত হয়।" (অনুচ্ছেদ ৩০, পৃ. ১৮৪-৮৫)।

ন্যায্যতার পথে যুক্তিচর্চার গুরুত্ব

তবে একথা সত্য যে চুক্তিমূলক যুক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে উভয় পক্ষের কিংবা বহুপক্ষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে কিছুটা সুফল পাওয়া যায়। রলসের আশা করেছিলেন, 'মানুষ যখন সামাজিক চুক্তির ঐকমত্যে উপনীত হবে, সবাই তখন সংকীর্ণ স্বার্থের পেছনে দৌড়ানো ত্যাগ করে সামাজিক চুক্তি যাতে কার্যকর থাকে এমন আচরণই করবে।' কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত রলস তাঁর "পলিটিকাল লিবারালিজম" গ্রন্থে এবিষয়ে বলেন: 'যুক্তিগ্রাহী ব্যক্তিগণ একটা সামাজিক ভূবন চান, যেখানে তারা স্বক্ষম ও সমান হিসেবে অন্যদের সঙ্গে এমন শর্তে যৌথ আচরণে যুক্ত হবেন, যা অন্যদের কাছেও গ্রহণযোগ্য। তারা চাইবেন এমন পারস্পরিক বিনিময়ের পরিমণ্ডল, প্রত্যেকেই যা থেকে সুবিধা পাবেন। বিপরীতে, যখন দেখা যাবে যে মানুষ অন্যদের সঙ্গে বিনিময়-সম্পর্কে জড়িত হচ্ছেন, অথচ যথার্থ ন্যায্য আচরণবিধির ধার ধারছেন না, আচরণবিধি ভাঙা সম্ভব হলেই স্বার্থের প্রয়োজনে তা ভাঙতে প্রস্তুত; তখন একটি মৌলিক অর্থে তারা আচরণ অ-যুক্তিগ্রাহী বলে গণ্য হবেন।' (পৃ. ৫০)।

চুক্তিপূর্ব ও চুক্তি-উত্তর আচরণে পার্থক্য

রলস অবশ্য চুক্তিপূর্ব ও চুক্তি-উত্তর মানুষের আচরণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। তবে আশা করেছেন যে মানুষ সামঞ্জস্যপূর্ণ যুক্তিগ্রাহী আচরণ করবে। রলস অবশ্য কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, চুক্তির মধ্যেই সামঞ্জস্যপূর্ণ যুক্তিগ্রাহী আচরণের কথা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অমর্ত্য সেন রলসের এই অবস্থান নিয়ে মন্তব্যে বলেছেন, 'রলসের তত্ত্বায়নকে তাই অপূর্ণ বা অসংহত বলে অভিযুক্ত করা যায় না। তবু প্রশ্ন থেকে যায়: আমরা যে বাস্তব জগতে বাস করি, যা রলস কল্পিত বিশ্ব নয়, সেখানে কীভাবে এই রাজনৈতিক মডেল আমাদের ন্যায্য বিচারের দিশা দেবে? সম্পূর্ণ ন্যায্য সামাজিক ব্যবস্থা নির্মাণ এবং তার সঙ্গে যথাযথ আচরণ যুক্ত হলে, সম্পূর্ণ ন্যায্য সমাজ গঠন যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে রলসের বক্তব্যের অর্থ আছে। কিন্তু তাহলে সামাজিক ন্যায্যতা সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠান্বেষী চিন্তা এবং আমাদের তুলনামূলক বিচারভঙ্গির মধ্যে একটা মস্ত বড় ও সমস্যাসংকুল দূরত্ব তৈরি হবে।' (নীতি ও ন্যায্যতা, পৃ. ১০৩)।

অমর্ত্য সেন রলসের তত্ত্বের পর্যাপ্ততা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। কারণ, সেনের মতে, 'তিনি (রলস) যখন সর্বশ্রেষ্ঠান্বেষী ন্যায্যতার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করছেন, তখন প্রোৎসাহের (ইনসেন্টিভ) দাবিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে বৈষম্যকে জায়গা ছাড়তে হচ্ছে। আমরা যদি "রেসকিউয়িং জাস্টিস অ্যান্ড ইনইকুয়ালিটি" গ্রন্থে প্রদত্ত জি এ কোহেনের যুক্তিটি গ্রহণ করি... মানুষকে যথাযথ আচরণে উদ্বুদ্ধ করতে (যা তাদের ন্যায্য পৃথিবীতে এমনিতেই করা উচিত, কোনো ব্যক্তিগত প্রোৎসাহ ছাড়াই) বৈষম্যকে ছাড় দেওয়া অনুচিত।' (নীতি ও ন্যায্যতা, পৃ. ১০৩)।

চুক্তিমূলক ন্যায্যতা ও গণতন্ত্র

চুক্তিমূলক ন্যায্যতায় যুক্তিপ্রয়োগের গুরুত্ব যেমন কেন্দ্রীয় ও মৌলিক বিষয়, ঠিক তেমনই গণতন্ত্রের চর্চাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমি যতদূর জানি গণতন্ত্রের অন্তত দুটি ধরন আছে। অবশ্য আমাদের দেশে একটি ধরনকেই গণতন্ত্রের একমাত্র ধরন হিসেবে সর্বাধিক মনে করা হয়। গণতন্ত্রের অন্তত দুটি ধরনের মধ্যে প্রথমটি হলো ডিরেক্ট ডেমোক্রেসি বা প্রকাশ্য গণতন্ত্র। প্রকাশ্য গণতান্ত্রিক চর্চার মধ্যে রয়েছে নির্বাচন, ভোট, অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষভাবে নাগরিকদের বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এবং সব রাজনৈতিক দলের জন্য সুযোগের সমতাসহ এধরনের আরও অনেক কিছুই রয়েছে।

গণতন্ত্রের দ্বিতীয় ধরনটি হলো ডেলিবারেটিভ ডেমোক্রেসি বা আলাপ-আলোচনা ভিত্তিক গণতন্ত্র। অর্থাৎ দেশের সরকারি সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করার আগে জনগণের মধ্যে প্রকাশ্য যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে বাড়িয়ে তোলা। আলোচনাভিত্তিক গণতন্ত্রকে সম-অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র হিসেবে অভিহিত করা যায়। কারণ—সেখানে প্রতিবাদ, মতবিনিময় ও অলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ রাজনীতির অন্যান্য বৈধ চর্চা বোঝায়, যা বিভিন্ন দেশে সাধারণভাবে অনুশীলন হয়ে আসছে। গণতন্ত্রের মূল বিষয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। অর্থাৎ সরাসরি অংশগ্রহণ কিংবা প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ নিজেই নিজেকে পরিচালিত করবে। কারণ, মানুষ সম্পর্কে মৌলিক গণতন্ত্রে মৌলিক বিশ্বাস হলো মানুষ পরাধীন নয়।

গণতন্ত্রের শক্তি সংরোধক ক্ষমতা (কাইন্টাভেইলিং পাওয়ার)

স্বাধীনতা মানুষের সব কর্মকাণ্ডের একেবারে কেন্দ্রীয় বিষয়। এখানে কানাডীয় বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধ্যাপক জন কেনেথ গলব্রেথের একটি ধারণা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি দীর্ঘদিন বিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকতা করেছেন এবং একই বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে

কাজ করেছেন। আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বছর, ১৯৫২ সালে তাঁর সাড়াজাগানো "আমেরিকান ক্যাপিটালিজম: দ্য কনসেপ্ট অব কাইন্টাভেইলিং পাওয়ার" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বইটিতে তিনি "কাইন্টাভেইলিং পাওয়ার" বা "সংরোধক ক্ষমতা" নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইডিয়ার আলোচনা করেন।

গলব্রেথ দেখান যে গণতন্ত্রের কার্যকারিতা খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারে, তখনই যখন ক্ষমতাপ্রত্যাশী একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর ওপর অন্য দলগুলোর সংরোধক ক্ষমতা কাজ করবে। ফলাফল হবে কোনো একটি গোষ্ঠী বা দল অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পারবে না অথবা এত বেশি ক্ষমতাবান হতে পারবে না, যাতে অন্যান্য দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয়। বাস্তবিকভাবে গণতন্ত্র এভাবে আরও বেশি কার্যকর ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে বলে গলব্রেথ মত দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে কর্তৃত্ববাদী শাসনধারা যদি কোথাও গড়ে ওঠে, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে রাষ্ট্রক্ষমতার বণ্টন নিয়ে কমিউনিস্ট ভাবধারার লোকদের এবিষয়ে অনাগ্রহ বেশ চোখে পড়ার মতো। সত্যিকারের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ভাবধারা প্রতিষ্ঠায় গলব্রেথের সংরোধক ক্ষমতার ধারণা সেসব একপেশে অবস্থা থেকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় জনগণকে আনতে সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস।

শেকসপিয়ারের "কিং জন" নাটকে একটি চমৎকার মন্তব্য রয়েছে: "প্রায়ই বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের সাধারণ মূল্যায়ন আমাদের নিজস্ব বিশেষ স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।" আমরা নিজেরা ধনী কিংবা গরিব বা বিশেষ কোনো পরিচিতির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখলে বিভিন্ন বিষয়ের মূল্যায়ন নিষ্পক্ষ দর্শক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার মানসিকতা অমাদের মধ্যে কাজ না-ও করতে পারে। নিজেরা নিজেদের প্রশ্রয় দিলে আত্মসমীক্ষার বিস্তৃতি সংকুচিত হয়ে পড়বে। এটি এ জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে বাস্তবে সমদর্শিতা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন 'সমদর্শী আচরণ'। আর নিজেদের মধ্যে এই সমদর্শী আচরণ নির্মাণে মৌলিকভাবে সাহায্য করবে অন্যদের দৃষ্টিকোণ ও তাদের ভাবনাচিন্তাগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন। আর তা করতে গেলে সাধারণ বিচারশীলতার গণ্ডির বাইরে সামাজিক ও রাজনৈতিক নৈতিকতার প্রয়োজন পড়বে। কিন্তু রলস যে কন্ট্রাকটারিয়ান বা চুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গিটি গ্রহণ করেছিলেন ,তার প্রধান বিষয় হলো, অমর্ত্য সেনের ভাষায়—'শেষ বিচারে তার (চুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি) মুখ্য বিষয় হলো বোঝাপড়ার মাধ্যমে পারস্পরিক সুবিধা অর্জন।" (নীতি ও ন্যায্যতা, পৃ. ২৩৪)।

৩. ন্যায্যতার অনুসন্ধান ও বাস্তব পৃথিবী

প্রাতিষ্ঠানিক ন্যায্যতা বনাম অপ্রাতিষ্ঠানিক ন্যায্যতা

অমর্ত্য সেনের ন্যায্যতা বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টিমূলক একটি উদ্ধৃতি এখানে খুব প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে কী ঘটছে তার ওপর দৃষ্টিপাত করা দরকার, শুধু প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাদির মূল্যায়নে ঐকান্তিক মনোনিবেশ করলে চলে না। দ্বিতীয়ত, ন্যায্যতার প্রশ্নে বিভিন্ন বিকল্পের তুলনামূলক বিচার করতে হবে, সম্পূর্ণ বা নিখুঁতভাবে ন্যায্য একটি ব্যবস্থার সন্ধান করলে চলবে না।... সমগ্র বইটিতে প্রকাশ্য যুক্তিপ্রয়োগ নিষ্পক্ষতার দাবিগুলোকে ব্যবহার করে সেটি অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে।' (নীতি ও ন্যায্যতা, পৃ. ৪৫৬)।

এ পর্যন্ত চুক্তি ও ন্যায্যতা নিয়ে দুটি ভিন্ন চিন্তাধারার দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে আলোচনা করা হলো। একটি হলো সামাজিক চুক্তির কাঠামোয় ন্যায্যতাসম্পর্কিত যুক্তিপ্রয়োগের ধারা। এই ধারাটি আরম্ভ হয় টমাস হবস থেকে। পরে এই ধারায় অবদান রাখেন জন লক, জ্যা-জাঁক রুশো ও ইমানুয়েল কান্ট। সমসাময়িক কালে চুক্তিমূলক ঐতিহ্যটিতে অবদান রেখেছেন জন রলস, রবার্ট নজিক, গতিয়ে, ডোয়ারকিনসহ

অন্যরা। আর চুক্তিমূলক এই ধারাটি গ্রহণ না করে সামাজিক চয়নের বিচারধারা যাঁরা অনুসরণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অমর্ত্য সেন, জঁ দ্রেজসহ অন্যরা। এই দ্বিতীয় ধারাটি দেখাতে চেয়েছে যে, সামাজিক চুক্তির ঐতিহ্যটি অত্যন্ত জ্ঞানদীপ্ত হলেও এটি ন্যায্যতার একটি প্রশস্ত ভিত্তি হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই বিচারধারার সীমাবদ্ধতাগুলো খুবই বেশি এবং শেষপর্যন্ত এটি ন্যায্যতা বিষয়ে বাস্তব যুক্তিপ্রয়োগের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ন্যায্যতার সীমাবদ্ধতা

তবে আমার পর্যবেক্ষণে আলোকায়নের দুটি ভিন্ন ধারার এই পরস্পরকে বাতিল করে দেওয়ার প্রবণতাটির সীমাবদ্ধতা হলো উভয়পক্ষই কতগুলো বাস্তবতার তত্ত্বায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমত, আমরা যে বাস্তব পৃথিবীতে বাস করি, তাতে মানুষকে দেখি তার জানা সমস্তকিছু প্রয়োগ করে অনুন্নত জীবন থেকে অধিকতর উন্নত জীবনের দিকে যাওয়ার নিরন্তর চেষ্টা করে চলতে। অর্থাৎ মানুষ হলো চিন্তা ও চর্চার গঠনমূলক অভিজ্ঞতার ফলে সৃষ্ট সামগ্রিক সত্তার বিশাল এক ভান্ডার। ফলে মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক দুটো ধারাই সমন্বিতভাবে কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে চায়। আবার এ কথাও সত্য, চুক্তিমূলক বা সর্বশ্রেষ্ঠান্বেষী ও তুলনামূলক বা ক্রমবর্ধমান ন্যায্যতার এই দুই বিপরীত ধারার মধ্যেও তাদের ভেতর কিছু সাদৃশ্যও রয়েছে। নইলে তাদের আলোকায়ন চিন্তাধারা নামকরণ করা হলো কেন? আর তা ছাড়া দুটি ধারাই যৌক্তিকতার ওপর বিশ্বাস রাখে এবং উভয় পক্ষই সামাজিক ও প্রকাশ্য যুক্তি-তর্ককে মৌলিকভাবে গুরুত্ব দেয়।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ন্যায্যতার সমন্বয়ে নতুন ন্যায্যতার নির্মাণ

হবস ও হিউম

উক্ত আলোচনায় আমার কতগুলো নতুন পর্যবেক্ষণ রয়েছে। পাঠকের কাছে আমার ভাবনা স্পষ্ট করার জন্য উক্ত দুটি ধারার একজন দার্শনিককে আমি বেছে নেব এবং তাঁর বিপরীত চিন্তাধারার অলোকায়ন যুগেরই অন্য একজন দার্শনিকের ভাবনাগুলো উপস্থাপন করব এবং বর্তমান সময়ের অন্যতম দার্শনিকের ব্যাখ্যার সঙ্গে কিছুটা দ্বিমত করে আমার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করার চেষ্টা করব। সামাজিক চুক্তির প্রবক্তা দার্শনিক টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) ন্যায্যতা নিয়ে যা ভেবেছেন, তার কেন্দ্রে রয়েছে রাষ্ট্র।

অর্থাৎ হবসের ন্যায্যতার ধারণা গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। হবসের চোখে মানুষ হলো অসভ্য, বর্বর, আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক এবং অযৌক্তিক আচরণে পূর্ণ এক সত্তা। সুতরাং সে সভ্য ও নিয়ম মেনে চলবে, যখন সে একটি সামাজিক চুক্তির ভেতর দিয়ে যাবে; যেখানে সে অপরের অধিকারের সীমাকে ভঙ্গ না করার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। আর এর অন্যথা কেউ করলে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র আইন ভঙ্গকারীকে তার ক্ষমতা বলে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিচারের আওতায় আনবে।

হবস পড়ে আমার মনে হয়েছে, সম্ভবত হবসের চিন্তায় ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বলপ্রয়োগের ধারণাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থাৎ জনসাধারণ খুবই বিশৃঙ্খল ও অন্যায্যতাপ্রিয় এবং এর উৎস তার ব্যক্তিস্বার্থ। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাদের শৃঙ্খলায় আনতে হবে। আর এই বলপ্রয়োগের বৈধতার জন্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রয়োজন। তিনি আশা করেছিলেন, প্রতিষ্ঠানগুলো নিষ্পক্ষ ও বিশুদ্ধভাবে ন্যায্য হলে তার পক্ষে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভেতর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে। কারণ, সার্বভৌম রাষ্ট্রের নানা ধরনের বিস্তৃত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার কাজটি করে এই প্রতিষ্ঠানসমূহ।

বর্তমান সময়ের দার্শনিক অমর্ত্য সেন হবসের ন্যায্যতা চিন্তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অমর্ত্য সেন বলেন,'তিনি (হবস) মনে করতেন যে ন্যায্যতার প্রাতিষ্ঠানিক দাবিগুলো কেবল সার্বভৌম রাষ্ট্রের সীমার মধ্যেই মিটতে পারে, অর্থাৎ ন্যায্যতার জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন এবং সেগুলোকে গড়ে তোলা ও সচল রাখার জন্য আবশ্যক সার্বভৌম রাষ্ট্র।' কিন্তু দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) টমাস হবসের মতো করে ভাবতেন না। প্রকৃতপক্ষে হিউমের চিন্তা হবসের ঠিক বিপরীত। হিউম ন্যায্যতাকে কোনো সুনির্দিষ্ট সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভেতর খোঁজেননি। অমর্ত্য সেন ডেভিড হিউম স্মারক বক্তৃতায় এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন:'প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাটা হিউমের চিন্তাতেও খুবই গুরুত্ব পেয়েছে, এবং এ বিষয়ে তাঁর গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন আলোচনা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ন্যায্যতার বিষয়ে তিনি তাঁর চিন্তাকে সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংকীর্ণ ধারণার মধ্যে আটকে রাখেননি। রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে বৈশ্বিক ন্যায্যতা বলে কিছু হতে পারে না, এমন কোনো ধারণা তাঁর চিন্তায় স্থান পায়নি।... বিদ্যমান ব্যবস্থাপনাগুলোর মধ্যে কী কী অন্যায্যতা আছে, সেগুলো চিহ্নিত করার কাজটিও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা করতে গিয়ে আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রচলিত সীমানাটাকে বদলে ফেলতে হবে।... এটা হয়তো হিউমের বিশ্ব-ন্যায্যতার চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কিত—বিদেশের সঙ্গে যেভাবে আমাদের বাণিজ্য বিস্তার ঘটে চলেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংবেদন ও যুক্তি প্রয়োগকেও এই কথাটা হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে যে "ন্যায্যতার পরিধিটা ক্রমে বিস্তৃত হয়ে চলেছে"। ন্যায্যতা কেবল একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের লোকদের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এমন কোনো চিন্তায় আটকে থাকা চলে না।'

হিউম-স্মারক বক্তৃতায় অমর্ত্য সেন হিউমের চিন্তাগুলোর বর্তমান পৃথিবীতে প্রাসঙ্গিকতার অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন: 'হিউমের অনেক নতুন এবং পথপ্রবর্তক চিন্তা সমসাময়িক আলাপ-আলোচনায় যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। তাঁকে আলোকায়ন (এনলাইটেনমেন্ট) যুগের অগ্রণী "মহা-দার্শনিক" শিরোপায় ভূষিত করা হলেও, তাঁর চিন্তা বিষয়ে অবহেলাগুলো চলেই এসেছে।' অমর্ত্য সেন হিউমের অন্তর্দৃষ্টির প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। অধ্যাপক সেনের ভাষায়,'হিউমের অন্তর্দৃষ্টিগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে, নৈতিক বিষয়গুলোকে ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ক্ষেত্রে তথ্য ও জ্ঞানের গুরুত্বকে স্বীকার করা। অন্য একটি ব্যাপার হচ্ছে, মানব সংবেদনের (সেন্টিমেন্টস) জোরালো ভূমিকাটাকে অগ্রাহ্য না করেও যুক্তির গুরুত্বকে মেনে নেওয়া। তা ছাড়া তাঁর অন্তর্দৃষ্টি আমাদের শেখায় যে যারা এই পৃথিবীর অন্যত্র, আমাদের থেকে বহু দূরে বাস করেন, এমনকি যারা এখনো জন্মাননি, ভবিষ্যতে এই পৃথিবীর বাসিন্দা হবেন, তাদের কথা ভাবাও আমাদের দায়িত্ব।'স্কটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম সবসময় যে ভারী ভারী কথা বলেছেন তা নয়। তার একটি কথা আমাদের মুডকে একটু হালকা করতে সাহায্য করতে পারে। হিউমের কথাটি হলো 'সেই ব্যক্তিই সুখী, যার মেজাজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এর চেয়েও বেশি সুখী সেই ব্যক্তি, যিনি যেকোনো পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের মেজাজ সহজেই খাপ খাওয়াতে পারেন।'

৫. অমর্ত্য সেন-উত্তর ন্যায্যতা

হবস, হিউম ও অমর্ত্য সেন

হবস, হিউম ও অমর্ত্য সেন পড়ে আমার কতগুলো পর্যবেক্ষণ মনে এসেছে। আমার মনে হয়, অমর্ত্য সেন-উত্তর ন্যায্যতা তত্ত্বের গভীরতার সম্প্রসারণ ও ন্যায্যতার পরিধি বাড়াতে আমার কিছু পর্যবেক্ষণ কাজে লাগতে পারে। বর্তমানে আমরা বিশ্বায়নের যে বিশেষ সময়টায় বাস করি, সেখানে হিউমের

ন্যায্যতা-চিন্তার বিশেষ কতগুলো দিকের প্রতি খুব সঠিকভাবেই অমর্ত্য সেন আমাদের মনোযোগ দিতে বলেছেন—ন্যায্যতাসংক্রান্ত আমাদের চিন্তার ঘাটতিগুলো যেন আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি।

অমর্ত্য সেনের এ অন্তর্দৃষ্টি আমরা কাজে লাগিয়ে পৃথিবীব্যাপী শ্রমের যে বৈশ্বিক বিভাজন রয়েছে বিশেষ করে, বর্তমান পৃথিবীতে উৎপাদনের যে বিশ্বময়তা রয়েছে, সেখানে কতগুলো সংকটের দিকে আমরা আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে পারি। বর্তমান সংকটগুলোর মধ্যে রয়েছে পরিবেশের ভয়ংকর বিপর্যয় ও জলবায়ু সংকট, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি ও অভিবাসী শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুর্দশা, ব্যক্তিপরিচয়ের একমাত্রিকতার সংকট ও বিশ্বসম্প্রীতির ভেঙেপড়া সেতুবন্ধন, করোনা ভাইরাস মহামারির প্রেক্ষাপটে কাজ হারিয়ে আয় কমে যাওয়া ও টিকা বৈষম্য, স্বাস্থ্য পরিষেবার সমূহসংকট, শিক্ষার মৌলিক গুরুত্বের অভাব ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে অমর্ত্য সেনের ন্যায্যতার দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টিগুলো খুবই প্রাসঙ্গিক ও পরিস্থিতির উত্তরণে বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগিয়ে পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটানো যায়।

এক্ষেত্রে ভারতের জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সুখ্যাত অধ্যাপক ড. জয়তী ঘোষ সম্প্রতি একটি লেখায় বর্তমান পৃথিবীর বাস্তব অবস্থার ওপর চমৎকার আলো ফেলেছেন। তিনি বলেন, 'ভবিষ্যতের মহামারি ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সংকট কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য সরকারি খাতসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপক এবং বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদনসক্ষমতা তৈরি করা জরুরি। আর্থিক নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বৈশ্বিক কর সহযোগিতা। বৈশ্বিক কর সমন্বয়ের কাজটি সহজ হবে যদি বহুজাতিক কোম্পানিদের পুরোদমে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সমান কর প্রদান করতে বলা হয়। পাশাপাশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর তাদের মূল রাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি মুনাফা পাঠানোর বদলে সাবসিডিয়ারি রাষ্ট্রগুলোতে মুনাফার পরিমাণ ভাগ করে নেওয়াকে নিশ্চিত করা যায়। আর তা করতে পারলে বৈষম্য কমে আসবে এবং পিছিয়ে থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রয়োজনীয় সম্পদ পাবে।' (বণিক বার্তা, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১)।

অমর্ত্য সেনের ন্যায্যতা চিন্তার পর্যালোচনা

তাসত্ত্বেও হিউমের ন্যায্যতা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অমর্ত্য সেনের চিন্তাভাবনাকে আমার কিছুটা একপেশে মনে হয়েছে। কারণ, অমর্ত্য সেন আমাদের ন্যায্যতার ভাবনা-চিন্তাগুলোকে সার্বভৌম রাষ্ট্রের পরিধির বাইরে নিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করতে বলে ডেভিড হিউম ও টমাস হবসকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ন্যায্যতার প্রশ্নে হিউম ও হবসের চিন্তাগুলো পরস্পরকে বাইনারি বা বিপরীত মেরুর চিন্তা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সমস্যা আরও আছে।

অমর্ত্য সেন হিউমের চিন্তার বিশেষ কতগুলো দিক যেমন মানব সংবেদনগুলোকে যুক্তিপ্রয়োগের সঙ্গে সমন্বয় করার গুরুত্বের কথা অত্যন্ত জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'ডেভিড হিউমের জন্ম ৩০০ বছর আগে, ১৭১১ সালে। তাঁর সময়ের তুলনায় আজকের পৃথিবী অনেক বদলে গেছে ঠিকই, কিন্তু তাঁর চিন্তা ও অনুজ্ঞাগুলো (আইডিয়াস অ্যান্ড অ্যাডমোনিশনস) এখনো খুবই প্রাসঙ্গিক। অথচবর্তমান পৃথিবীতে তাঁর ভাবনাগুলো গুরুত্ব দেওয়ার বদলেযেন খানিকটা অবহেলাই করা হয়েছে। হিউমের অন্তর্দৃষ্টিগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে, নৈতিক বিষয়গুলো ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ক্ষেত্রে তথ্য ও জ্ঞানের গুরুত্বকে স্বীকার করা। অন্য একটি ব্যাপার হচ্ছে, মানব সংবেদনের (সেন্টিমেন্টস) জোরালো ভূমিকাটাকে অগ্রাহ্য না করেও যুক্তির গুরুত্বকে মেনে নেওয়া।'

ন্যায্যতার জ্ঞানতাত্ত্বিক সম্প্রসারণ বনাম ন্যায্যতার পারিসরিক সম্প্রসারণ

আমাদের চিন্তাভবনার এমন গুরুতর ঘাটতির দিকটি হিউমের বরাতে অমর্ত্য সেন আমাদের ধরিয়ে দিলেও হিউমের চিন্তার জগৎটিতে যুক্তি ও সংবেদনশীলতার মেলবন্ধনের অর্গানিক উৎসটি কেমন করে সৃষ্টি হয়েছে ও এগিয়েছে, তা সেন আমাদের বিশদভাবে দেখাননি। এসবের বাইরেও আমার মনে হয়েছে, অমর্ত্য সেনের হিউমীয় ন্যায্যতার ব্যখ্যা অনেকটা ন্যায্যতার জ্ঞানতাত্ত্বিক (এপিস্টেমলোজিক্যাল) সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পরিচালিত। অমর্ত্য সেন ন্যায্যতার জ্ঞানতত্ত্বে অবদান রাখতে গিয়ে ন্যায্যতার পারিসরিক (স্পেশাল) সম্প্রসারণের দিকে জোর কিছুটা কম দিয়েছেন। মোদ্দা কথা, সেন ন্যায্যতার জ্ঞানগত সমৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে এর পৃথিবীব্যাপী ন্যায্যতার পারিসরগত সম্প্রসারণের বিষয়টিকে কিছুটা উপেক্ষা করেছেন। আমার মতে, ন্যায্যতা কেবল তত্ত্বীয় উৎকর্ষতার বিষয় নয়, তত্ত্বীয় উন্নয়ন তো আছেই এর পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে ন্যায্যতার নানা ধরনের বাস্তব প্রয়োগ ঘটে চলেছে,যার আইনি ও সামাজিক নানা স্তরের অভিজ্ঞতাগুলোর দিকে আমাদের মনোযোগ ফেরানো জরুরি। কারণ, ন্যায্যতার যত সম্প্রসারণ ঘটবে এবং এর উৎকর্ষতা যতই বৃদ্ধি করা যাবে মানুষের স্বাধীনতা, সক্ষমতা, ভালো জীবন ও পরিবেশের সমূহক্ষতি থেকে নিজেদের এবং পরবর্তী প্রজন্মেকে রক্ষা করার সম্ভাবনা ততই বাড়িয়ে তোলা যাবে।

ক্রমবর্ধমান ন্যায্যতার পথে অগ্রসর হওয়া

স্বাধীনতা সম্পর্কে ফরাসি দার্শনিক ও লেখক আলবেয়ার কামুর একটি কথা স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন,'স্বাধীনতা আসলে আরো ভালো কিছু হওয়ার সুযোগ।' অমর্ত্য সেনের কাছে বৈশ্বিক ন্যায্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।বিশ্বব্যপী ব্যাপকতর অন্যায্যতা কমানোর জন্য এটির (বৈশ্বিক ন্যায্যতার) ওপর খুবই জোর দিচ্ছেন তিনি। কারণ, বিশ্বব্যাপী ন্যায্যতা প্রসারের মাধ্যমেই বিপুল অন্যায্যতার লাগাম টেনে ধরা যেতে পারে বলে সেন বিশ্বাস করেন। এই জায়গাটিতেই হিউমের ন্যায্যতার বৈশ্বিক সম্প্রসারণের ধারণার সঙ্গে অমর্ত্য সেনের চিন্তার সেতুবন্ধন রচিত হচ্ছে। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে অমর্ত্য সেন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সীমানার ভেতর ন্যায্যতা চর্চার সমস্যা ও সংকটগুলোর বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছন। বৈশ্বিক ন্যায্যতার সম্প্রসারণের জন্য সারা বিশ্বে যেসব সার্বভৌম রাষ্ট্র রয়েছে, সেগুলোর ভেতরকার বাধাগুলোর আলোচনা তো অপ্রাসঙ্গিক নয়। দার্শনিক টমাস হবস বৈশ্বিক ন্যায্যতার বিষয়টি বিশ্বাস করতেন না। কারণ, তাঁর মতে সেখানে ন্যায্যতার প্রয়োগ অসম্ভব। হবসীয় চিন্তার অনুসারী বর্তমান সময়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক টমাস নেগেল তাঁর ২০০৫ সালে প্রকাশিত 'দ্য প্রবলেম অব গ্লোবাল জাস্টিস' শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে বিষয়টিকে এভাবে বলছেন, 'হবসের কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে সারা পৃথিবীতে একটিমাত্র সরকার ব্যতিরেকে বৈশ্বিক ন্যায্যতার ধারণাটা অলীক কল্পনামাত্র।'

হবস যদি আজকের দিনে বেঁচে থাকতেন, তবে পৃথিবীর বর্তমান রূপ দেখে তাঁর কথাটি ঘোরাতেন বলে আমার মনে হয়। কারণ, ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের "সার্বজনীন মানবাধিকার সুরক্ষার ঘোষণাপত্র", ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বরে ঘোষিত সব দেশের সব মানুষের জন্য "নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষার আন্তর্জাতিক চুক্তি" ও "আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষার আন্তর্জাতিক চুক্তি" এসব সম্ভব হতো না। আর বৈশ্বিক ন্যায্যতা যদি সত্যি সত্যিই অলীক কল্পনার বিষয় হয়, তবে বিশ্বের নানা প্রান্তে মানুষের নানা ধরনের নাগরিক অধিকার অরক্ষিত হলে আমরা কেউই তা নিয়ে কোনো কথা বলতে পারতাম না। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা তা তো নয়। বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে নাগরিক অধিকার হরণ কিংবা পরিবেশের ক্ষতির বিষয়ে আমরা বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদ ও আলোচনার আওয়াজ তুলতে দেখছি,

যা প্রমাণ করে—আমরা পৃথিবীর মানুষ একটিমাত্র সভ্যতার অংশীদার—প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতার মতো পরস্পরকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়ার বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন সভ্যতার ধারণাকে আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বৈশ্বিক সক্ষমতারও কতগুলো ঘাটতির দিক রয়ে গেছে, নইলে বিশ্বব্যাপী এতটা আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থচিন্তা, করোনা ভাইরাসের টিকার সরবরাহে ধনী ও দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ব্যাপকতর বৈষম্য দেখতে হতো না। ফলে অমর্ত্য সেন হিউমকে হবসের বিপরীতে স্থাপন করতে গিয়ে নিজেকে কিছুটা বিপদে ফেলেছেন।

ন্যায্যতার সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি

আমার মতে, ন্যায্যতার দর্শনে টমাস হবস ও ডেভিড হিউম দুজনই মহান দার্শনিক। প্রত্যেকেই চিন্তা গড়ে তুলে তাঁর সময়ে বিদ্যমান নানা সংকটের দার্শনিক মোকাবিলা করেছেন ও মানবজাতির সংকট উত্তরণে পথ দেখিয়েছেন। আর তা ছাড়া সময়ের হিসেবে হবস এ পৃথিবীতে আগে এসেছেন এবং ন্যায্যতার প্রশ্নগুলো তাকে আগে ভাবতে হয়েছে। ন্যায্যতার চিন্তা হবসের অবদানে সমৃদ্ধ হওয়ার পর যে অগ্রসর অবস্থা হিউম পরে এসে পেয়েছেন, সেখান থেকে তিনি শুরু করেছেন। ন্যায্যতার তত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে গিয়ে হবসের ভাবনাগুলোর সীমাবদ্ধতা নিয়ে হিউম গভীরভাবে ভেবেছেন এবং সেগুলোর সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে ন্যায্যতার নতুন তাত্ত্বিক নির্মাণের দিকে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। ফলে আমার মতে, আমরা যদি এ দুই মহান দার্শনিকের চিন্তাধারার ভিন্ন প্রবাহকে সমন্বিত করে দেখার চেষ্টা করি, তবে অমর্ত্য সেনের খানিকটা একপেশে ভাবনার সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হতে পারে। ন্যায্যতার পরিধির আলোচনা কোনো স্থির তাত্ত্বিক আলোচনায় আটকে থাকতে পারে না। বরং এটি হবে একটি গতিশীল ও বহুমুখী আলোচনা এবং চিন্তাচর্চার ক্ষেত্র। আমরা যে পৃথিবীটায় বাস করি, সেখানে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানগুলোর বিপুল ব্যর্থতা লক্ষ করছি। হবসের সার্বভৌম রাষ্ট্রের গণ্ডির ভেতর ন্যায্যতার দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও কোনো রাষ্ট্রই বাস্তব ক্ষেত্রে বলতে পারবে না যে তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো শতভাগ ন্যায্যতার বাস্তবায়ন করতে পেরেছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সব ব্যবস্থা ও সুবিধা থাকার পরও অনেক ধরনের ঘাটতি রয়ে গেছে। অমর্ত্য সেন হিউমের চিন্তায় আকৃষ্ট হয়ে হবস ও হবসীয় চিন্তাধারার সমালোচনা করে এ ঘাটতির দিকটি তাঁর চোখ এড়িয়েই গেছে বলে আমার মনে হয়েছে।

কিন্তু আমি নির্দ্বিধায় এ কথা স্বীকার করব, অমর্ত্য সেনের লেখা বিশেষ করে ২০০৯ সালে প্রকাশিত তাঁর বিপুল সাড়াজাগানো গ্রন্থ "দ্য আইডিয়া অব জাস্টিস" গ্রন্থের সঙ্গে আমার পরিচয় না ঘটলে ন্যায্যতা ও নীতিসংক্রান্ত দার্শনিক ও ব্যবহারিক আলোচনার এই সক্ষমতা আমার মধ্যে কিছুতেই গড়ে উঠত না। আমার জীবনে অমর্ত্য সেনের এই গ্রন্থের অবদানকে এককথায় আমি আমার পুনর্জন্ম হিসেবেই দেখি। তাঁর এই গ্রন্থপাঠে কেবল আমার চিন্তার পরিধির সম্প্রসারণই ঘটেনি বরং ব্যক্তি হিসেবে যাপিত জীবনের চর্চায়ও আমার আগের সব কিছুই বদলে দিয়েছে। সুতরাং ন্যায্যতা চিন্তায় আমাদের এমন কাঠামো নির্মাণ করতে হবে যেটি "বাস্তব পৃথিবীর ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক প্রয়োজন"কে "সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি"র আওতায় মানবজাতির সবধরনের অভিজ্ঞতাকে ধারন করতে পারবে। আমার প্রস্তাবে এই নতুন কাঠামোটি ন্যায্যতার জ্ঞানগত ও পারিসরিক উভয় দিকেই সম্প্রসারিত হতে পারবে। আর সেই কাজ করতে গেলে আমাদের ন্যায্যতা প্রশ্নে হবস, হিউম ও অমর্ত্য সেন—এই তিনজন মহান দার্শনিকের চিন্তার সুষম ও সু-স্থায়ী সমন্বয় করতে হবে। কোনো কিছুকে বাতিল করে দেওয়ার অহম কোনো কাজের কথা নয়—তা আমরা তখন বুঝতে পারব।

তথ্যসূত্র

1. Osmani, S. R. (2010). Theory of Justice for an Imperfect World: Exploring Amartya Sen's Idea of Justice. *Journal of Human Development and Capabilities*, *11*(4),599–607. https://doi.org/10.1080/19452829. 2010. 520965

2. Sen, A. (2009). *The Idea of Justice* (1st ed.). Belknap Press of Harvard University Press.

3. Sen, A. (2011b, December 29). The Boundaries of Justice: David Hume and our world. *The New Republic*, *242*(Number-20(4915)). https:// newrepublic. com/ article/98552/hume-rawls-boundaries-justice

5. অমর্ত্য সেন. (2021, June 10).ন্যায্যতার পরিধি: ডেভিড হিউম ও আমাদের পৃথিবী. (প্রথম কিস্তি) (The Boundaries of Justice: David Hume and our world). Chowdhury, A. J.(আহমেদ জাভেদ) (Trans.). *The Daily Bonik Barta*. https://bonikbarta.net/ home/news _description/265758/ন্যায্যতার-পরিধি:-ডেভিড-হিউম-ও-আমাদের-পৃথিবী

৫. অমর্ত্য সেন. (2021, June 11). ন্যায্যতার পরিধি: ডেভিড হিউম ও আমাদের পৃথিবী. (দ্বিতীয় ও শেষ কিস্তি) (The Boundaries of Justice: David Hume and our world). Chowdhurz, A. J.(আহমেদ জাভেদ) (Trans.).*The Daily Bonik Barta*. https:// bonikbarta.net/home/ news_description/265834/ ন্যায্যতার-পরিধি:-ডেভিড-হিউম-ও-আমাদের-পৃথিবী

৬. জয়তী ঘোষ. (2021, September 10).কভিড-১৯: অনিবার্য পতন নাকি সহযোগিতার পথে হাঁটব. *The Daily Bonik Barta*. https://bonikbarta.net/ home/news_ description/ 274030/ অনিবার্য-পতন-নাকি-সহযোগিতার-পথে-হাঁটব-

৭. রজওয়ানুল ইসলাম. (জুলাই ২০১৯). অধ্যায় ১: কর্মসংস্থান, বেকারত্ব এবং প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব: ধারণা ও পরিমাপ. In*উন্নয়ন ভাবনায় কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার* (পৃ. ৫-৮). ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল)